প্রবন্ধ

ধর্ম / দর্শন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

- সাকার ও নিরাকার উপাসনা 2
- নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা 15
- ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি 17
- চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব 19
- নব্য লয়তত্ত্ব 24
- বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা 30
- রামমোহন রায় 48
- সুখ না দুঃখ 63

সাকার ও নিরাকার উপাসনা

সম্প্রতি কিছুকাল হইতে সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া তীব্রভাবে সমালোচনা চলিতেছে। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা এম্‌নি ভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নিরাকার উপাসনা যেন হিন্দুধর্মের বিরোধী। এইজন্য তাহার প্রতি কেমন বিজাতীয় আক্রোশে আক্রমণ চলিতেছে। এইরূপে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতে তাঁহাদের পরম হিন্দুত্বের অভিমান কিছুমাত্র সংকুচিত হইতেছে না। তাঁহারা মনে করিতেছেন না, ব্রাহ্ম বলিয়া আমরা বৃহৎ হিন্দুসম্প্রদায়ের বহির্ভূত নহি। হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধপক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।

বুলবুলের লড়াইয়ে যেমন পাখিতে পাখিতেই খোঁচাখুঁচি চলে অথচ উভয়পক্ষীয় লোকের গায়ে একটিও আঁচড় পড়ে না, আমি বোধ করি অনেক সময়ে সেইরূপ কথাতে কথাতে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায় অথচ উভয়পক্ষীয় মত অক্ষত দেহে বিরাজ করিতে থাকে। সাকার ও নিরাকার উপাসনার অর্থই বোধ করি এখনো স্থির হয় নাই। কেবল দুটো কথায় মিলিয়া বাঁও-কষাকষি করিতেছে।

একটি মানুষকে যখন মুক্ত স্থানে অবারিতভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সে যখন স্বেচ্ছামতে চলিয়া বেড়ায়, তখন সে প্রতিপদক্ষেপে কিয়ৎপরিমাণ মাত্র স্থানের বেশি অধিকার করিতে পারে না। হাজার গর্বে স্ফীত হইয়া উঠুন বা আড়ম্বর করিয়া পা ফেলুন, তিন-চারি হাত জমির বেশি তিনি শরীরের দ্বারায় আয়ত্ত করিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সে বেচারাকে সেই তিন-চারি হাত জমির মধ্যেই বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সে কি একই কথা হইল! আমি বলি ঈশ্বর-

উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ হৃদয়ের বিস্তারজনক ও স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতাই অপৌত্তলিকতা এবং তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের সংকীর্ণতা-জনক ও অস্বাস্থ্যজনক রুদ্ধভাবই পৌত্তলিকতা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের দৃষ্টির দোষে আমরা সমুদ্রের সবটা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাই বলিয়া একজন বিজ্ঞব্যক্তি যদি বলেন– এত খরচপত্র ও পরিশ্রম করিয়া সমুদ্র দেখিতে যাইবার আবশ্যক কী! কারণ, হাজার চেষ্টা করিলেও তুমি সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখিতে পাইবে মাত্র সমস্ত সমুদ্র দেখিতে পাইবে না। তাই যদি হইল তবে একটা ডোবা কাটিয়া তাহাকে সমুদ্র মনে করিয়া লও-না কেন? তবে তাঁহার সে কথাটা পৌত্তলিকের মতো কথা হয়। আমরা মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই যদি সব হইত যে ব্যক্তি আধগ্লাস জল খায় তাহার সহিত সমুদ্রপায়ী অগস্ত্যের তফাত কী? আমি যেন বলপূর্বক ডোবাকেই সমুদ্র মনে করিয়া লইলাম কিন্তু সমুদ্রের সে বায়ু কোথায় পাইব, সে স্বাস্থ্য কোথায় পাইব, সেই হৃদয়ের উদারতাজনক বিশালতা কোথায় পাইব, সেটা তো আর মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই হয় না!

আমরা অধীন এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু অধীন বলিয়াই স্বাধীনতার চর্চা করিয়া আমরা এত সুখ পাই– আমরা সসীম সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সসীম বলিয়াই আমরা ক্রমাগত অসীমের দিকে ধাবমান হইতে চাই, সীমার মধ্যে আমাদের সুখ নাই। “ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।’ আমরা দুর্বল বলিয়া আমাদের যতটুকু বল আছে তাহাও কে বিনাশ করিতে চায়, আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাহাও কে অপহরণ করিতে চায়, আমরা বর্তমানে দরিদ্র বলিয়া আমাদের সমস্ত ভবিষ্যতের আশাও কে উন্মূলিত করিতে চায়। আমাদের পথ রুদ্ধ করিয়ো না, আমাদের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান আছে আর সমস্তই পথ– অতএব আমাদিগকে ক্রমাগতই চলিতে হইবে, অগ্রসর হইতে হইবে; কঞ্চির বেড়া বাঁধিয়া আমাদের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়ো না।

কেহ কেহ পৌত্তলিকতাকে কবিতার হিসাবে দেখেন। তাঁহারা বলেন কবিতাই পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতাই কবিতা। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা

ভাবমাত্রকে আকার দিতে চাই, ভাবের সেই সাকার বাহ্যস্ফূর্তিকে কবিতা বলিতে পার বা পৌত্তলিকতা বলিতে পার। এইরূপ ভাবের বাহ্য প্রকাশচেষ্টাকেই ভাবাভিনয়ন বলে।

কিন্তু কবিতা পৌত্তলিকতা নহে- অলংকারশাস্ত্রের আইনই পৌত্তলিকতা। ভাবাভিনয়নের স্বাধীনতাই কবিতা। ভাবাভিনয়নের অধীনতাই অলংকারশাস্ত্রসর্বস্ব পদ্য রচনা। কবিতায় হাসিকে কুন্দকুসুম বলে কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে হাসিকে কুন্দকুসুম বলিতেই হইবে। ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের সংকীর্ণতাবশত সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবিতে পারি কিন্তু পৌত্তলিকতায় তাঁহাকে বিশেষ একরূপ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ভাবিতেই হইবে। অন্য কোনো গতি নাই। কিন্তু কবরের মধ্যে জীবন বাস করিতে পারে না। কল্পনা উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে যদি মূর্তি গড়া যায় ও সেই মূর্তির মধ্যেই যদি মনকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছুদিন পরে সে মূর্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্তিটাই সর্বেসর্বা হইয়া উঠে, যাহার জন্য তাহার আবশ্যক সে অবসর পাইবামাত্র ধীরে ধীরে শৃঙ্খল খুলিয়া কখন যে পালাইয়া যায় আমরা জানিতেও পারি না। ক্রমেই উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না- মনুষ্যপ্রকৃতিরই এই ধর্ম।

যেখানে চক্ষুর কোনো বাধা নাই এমন এক প্রশস্ত মাঠে দাঁড়াইয়া চারি দিকে যখন চাহিয়া দেখি, তখন পৃথিবীর বিশালতা কল্পনায় অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় প্রসারিত হইয়া যায়। কিন্তু কী করিয়া জানিলাম পৃথিবী বিশাল? প্রান্তরের যতখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে ততখানি যে অত্যন্ত বিশাল তাহা নহে। আজন্ম আমরণকাল যদি এই প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া থাকিতাম আর কিছুই না দেখিতে পাইতাম তবে এইটুকুকেই সমস্ত পৃথিবী মনে করিতাম- তবে প্রান্তর দেখিয়া হৃদয়ের এরূপ প্রসারতা অনুভব করিতাম না। কিন্তু আমি না কি স্বাধীনভাবে চলিয়া বেড়াইয়াছি সেইজন্যই আমি জানিয়াছি যে, আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াও পৃথিবী বর্তমান। সেইরূপ যাঁহারা সাধনা দ্বারা স্বাধীনভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহারা যদিও একেবারে অনন্ত স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারেন না তথাপি তাঁহারা ক্রমশই হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিতে থাকেন। স্বাধীনতা প্রভাবে তাঁহারা জানেন যে যতটা তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে পাইতেছেন তাহা

অতিক্রম করিয়াও ঈশ্বর বিরাজমান। হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতা আছে, সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়িবার উপায়। পৌত্তলিকতায় তাহার বাধা দেয়। অতএব, নিরাকার উপাসনাবাদীরা আমাদিগকে কারাগার হইতে বাহির হইতে বলিতেছেন, অসীমের মুক্ত আকাশ ও মুক্ত সমীরণে স্বাস্থ্য বল ও আনন্দ লাভ করিতে বলিতেছেন, কারাগারের অন্ধকারের মধ্যে সংকোচ বিসর্জন করিয়া আসিয়া অসীমের বিশুদ্ধ জ্যোতি ও পূর্ণ উদারতায় হৃদয়ের বিস্তার লাভ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানের বন্ধন মোচন করিতে আত্মার সৌন্দর্য সাধন করিতে উপদেশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, কারার মধ্যে অন্ধকার অসুখ অস্বাস্থ্য; অনন্তস্বরূপের আনন্দ-আহ্বানধ্বনি শুনিয়া দুঃখ শোক ভুলিয়া বাহির হইয়া আইস- ব্যবধান দূর করিয়া অনন্তসৌন্দর্য-স্বরূপ পরমাত্মার সম্মুখে জীবাত্মা প্রেমে অভিভূত হইয়া একবার দণ্ডায়মান হউক, সে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগৎচরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের মিলন হইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিণত হউক। তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে এক লম্ফে অসীমকে অতিক্রম করিতে হইবে, দূরবীক্ষণ কষিয়া অসীমের সীমা নির্দেশ করিতে হইবে, অসীমের চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া অসীমকে আমাদের বাগানবাটির সামিল করিতে হইবে। তাঁহারা কেবল বলেন সুখশান্তি স্বাস্থ্য মঙ্গলের জন্য অসীমে বাস করো অসীমে বিচরণ করো, পরিবর্তনশীল বিকারশীল আচ্ছান্নকারী বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সীমার দ্বারা আত্মাকে অবিরত বেষ্টিত করিয়া রাখিয়ো না। সূর্যকিরণের অধিকাংশই সৌরজগতে নিযুক্ত আছে, অধিকাংশ অসীম আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই সর্ষপ পরিমাণ পৃথিবীতে সূর্যকিরণের কণামাত্র পড়িয়াছে। তাই বলিয়া এমন পৌত্তলিক কি কেহ আছেন যিনি বলিতে চাহেন এই আংশিক সূর্যকিরণের চেয়ে দীপশিখা পৃথিবীর পক্ষে ভালো! মুক্ত সূর্যকিরণসমুদ্রে পৃথিবী ভাসিতেছে বলিয়াই পৃথিবীর শ্রী সৌন্দর্য স্বাস্থ্য ও জীবন। পরমাত্মার জ্যোতিতেই আত্মার শ্রী সৌন্দর্য জীবন। আত্মা ক্ষুদ্র বলিয়া পরমাত্মার সমগ্র জ্যোতি ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি দীপশিখাই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে?

অভিজ্ঞতার প্রভাবেই হউক অথবা যে কারণেই হউক, বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি আমরা অনেক সময় অবিশ্বাস করিয়া থাকি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যেখানে আকাশের সীমা দেখি সেখানেই যে তাহার বাস্তবিক সীমা তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। চিত্রবিদ্যা অথবা দৃষ্টিবিজ্ঞানে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা জানেন আমরা চোখে যাহা দেখি মনে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্তন করিয়া লই- দূরাদূর অনুসারে দ্রব্যের প্রতিবিম্বে যে-সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহার অনেকটা আমরা সংশোধন করিয়া লই। অধিকাংশ সময়েই চোখে যাহাকে ছোটো দেখি মনে তাহাকে বড়ো করিয়া লই- চোখে যেখানে সীমা দেখি মনে সেখান হইতেও সীমাকে দূরে লইয়া যাই। অন্তরিন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের মধ্যে যদি-বা সীমা দেখিতে পাই তথাপি আমরা সেই সীমাকে বিশ্বাস করি না। অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্ষমতা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে সর্বতোরূপে তাহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা নহে। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চাঁদকে যত বড়ো দেখায় চাঁদ তাহার চেয়ে অনেক বড়ো আমরা জানি তথাপি দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারি না- তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে গেলে ঈশ্বরকে যদি-বা সীমাবদ্ধ দেখায় তথাপি আমরা অন্তরিন্দ্রিয়কে অবহেলা করিতে পারি না- কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তাহাকে চূড়ান্ত মীমাংসক বলিয়া গণ্য করি না।

অসীমতা কল্পনার বিষয় নহে, সীমাই কল্পনার বিষয়। অসীমতা আমাদের সহজ জ্ঞান সহজ সত্য। সীমাকেই কষ্ট করিয়া পরিশ্রম করিয়া কল্পনা করিতে হয়। সীমা সম্বন্ধেই আমাদিগকে মিলাইয়া দেখিতে হয়, অনুমান ও তর্ক করিতে হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। যেমন সকল ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গেই স্বরবর্ণ পূর্বে কিংবা পরে বিরাজ করেই তেমনি অনন্তের ভাব আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সহিত সহজে লিপ্ত রহিয়াছে। এইজন্য অসীমের ভাব আমাদের কল্পনার বিষয় নহে তাহা লক্ষ্য ও অলক্ষ্য ভাবে সর্বদাই আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। মনে করুন, আমরা ষাট ক্রোশ একটা মাঠের মধ্যে বসিয়া আছি। আমরা বিলক্ষণ জানি এ মাঠ আমাদের দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে এবং আমরা ইহাও নিশ্চয় জানি এ মাঠ অসীম নহে- কিন্তু তাই বলিয়া যদি

মাঠের ঠিক ষাটক্রোশব্যাপী আয়তনই কল্পনা করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে সে চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। আমরা তখন বলিয়া বসি এ মাঠ অসীম, অসীম বলিলেই আমরা আরাম পাই, সীমা নির্ধারণের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাই। –সমুদ্রের মাঝখানে গেলে আমরা বলি সমুদ্রের কূলকিনারা নাই। আকাশের কোথাও সীমা কল্পনা করিতে পারি না, এইজন্য সহজেই আমরা আকাশকে বলি অসীম, আকাশকে সসীম কল্পনা করিতে গেলেই আমাদের মন অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, অক্ষম হইয়া পড়ে। কালকে আমরা সহজেই বলি অনন্ত, নক্ষত্রমণ্ডলীকে আমরা সহজেই বলি অগণ্য– এইরূপে সীমার সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া অসীমের মধ্যেই শান্তি লাভ করি। অসীম আমাদের মাতৃক্রোড়ের মতো বিশ্রামস্থল, শিশুর মতো আমরা সীমার সহিত খেলা করি এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই অসীমের কোলে বিশ্রাম লাভ করি– সেখানে সকল চেষ্টার অবসান– সেখানে কেবল সহজ সুখ, সহজ শান্তি, সেখানে কেবলমাত্র পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন। এই চিরপুরাতন চিরসঙ্গী অসীমকে বলপূর্বক বিভীষিকারূপে খাড়া করিয়া তোলা অতি-পণ্ডিতের কাজ। তর্ক করিয়া যাঁহাদিগকে মা চিনিতে হয় মাকে দেখিলে তাহাদের সংশয় আর কিছুতেই ঘুচে না, কিন্তু স্বভাব-শিশু মাকে দেখিলেই হাত তুলিয়া ছুটিয়া যায়। সীমাতেই আমাদের শ্রান্তি, অসীমেই আমাদের শান্তি, ভূমৈব সুখং, ইহা লইয়া আবার তর্ক করিব কী! সীমা অসংখ্য, অসীম এক, সীমার মধ্যে আমরা বিক্ষিপ্ত, অসীমের মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত, সীমার মধ্যে আমাদের বাসনা, অসীমের মধ্যে আমাদের তৃপ্তি, ইহা লইয়া বিচার করিতে বসাই বাহুল্য। বুদ্ধি যখন দীপের আকার ধারণ করে তখন তাহা কাজে লাগে, যখন আলেয়ার আকার ধারণ করে তখন তাহা অনর্থের মূল হয়। অতএব পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমরা কেবল সীমায় সাঁতার দিয়া মরি কিন্তু অসীমে নিমগ্ন হইয়া বাঁচিয়া যাই।

পৌত্তলিকতার এক মহদ্দোষ আছে। চিহ্নকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায় এইজন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেইদিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরির নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই ভবযন্ত্রণা

হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যকই বোধ হয় না। ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্যমাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে এবং সেইজন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষাচিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।

আসল কথা, আমাদের সীমা ও অসীমতা দুইই চাই। আমরা পা রাখিয়াছি সীমার উপরে, মাথা তুলিয়াছি অসীমে। আমাদের একদিকে সীমা ও একদিকে অসীম। বস্তুগত (realistic) কবিতার দোষ এই, সে আমাদের কল্পনার চোখে ধুলা দিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অসীমের পথ লুপ্ত করিয়া দেয়। বস্তুগত কবিতায় বস্তু নিজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে– আমাতেই সমস্ত শেষ, আমাকে ঘ্রাণ করো, আমাকে স্পর্শ করো, আমাকে ভক্ষণ করো, আমাকেই কায়মনোবাক্যে ভোগ করো। কিন্তু ভাব প্রধান (suggestive) কবিতার গুণ এই, সে আমাদিগকে এমন সীমারেখাটুকুর উপর দাঁড় করাইয়া দেয় যাহার সম্মুখেই অসীমতা। ভাবগত কবিতায় বস্তু কেবলমাত্র অসীমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ইশারা করিয়া দেখাইয়া দেয়, চোখের অতিশয় কাছে আসিয়া অসীম আকাশকে রুদ্ধ করিয়া দেয় না। আমরা চিহ্ন না হইলে যদি না ভাবিতেই পারি তবে সে চিহ্ন এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহা গণ্ডি হইয়া না দাঁড়ায়। যাহাতে সে কেবল ভাবকে নির্দেশ করিয়া দেয়, ভাবকে আচ্ছন্ন না করে।

ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিতে গিয়া ভক্তের মন মনুষ্যস্বভাববশত সহজেই বলিতে পারে “আমি ঈশ্বরের চরণচ্ছায়ায় আছি’ তাহাতে আমার মতে পৌত্তলিকতা হয় না। কিন্তু যদি কেহ সেই চরণের অঙ্গুলি পর্যন্ত গণনা করিয়া দেয়, অঙ্গুলির নখ পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া দেয়, তবে তাহাকে পৌত্তলিকতা বলিতে হয়। কারণ, শুদ্ধমাত্র ভাব- নির্দেশের পক্ষে

এরূপ বর্ণনার কোনো আবশ্যক নাই– কেবল আবশ্যক নাই যে তাহা নয়, ইহাতে করিয়া ভাব হইতে মন প্রতিহত হইয়া বস্তুর মধ্যে রুদ্ধ হয়।

“চরণচ্ছায়ায় আছি’ বলিতে গেলেই অমনি যে রক্তমাংসের একজোড়া চরণ মনে পড়িবে তাহা নহে। চরণের তলে পড়িয়া থাকিবার ভাবটুকু মনে আসে মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যদি কোনো কবি বলেন বসন্তের বাতাস মাতালের মতো টলিতে টলিতে ফুলে ফুলে প্রবাহিত হইতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটি মাতালের ছায়াছবি জাগিয়া উঠিবে; তাহার চলার ভাবের সহিত বাতাসের চলার ভাবের তুলনা করিয়া সাদৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু তাই বলিয়া কি সত্যসত্যই কোনো মহাপণ্ডিত অঙ্গুলিবিশিষ্ট, নখবিশিষ্ট, বিশেষ কোনো বর্ণবিশিষ্ট, রোমবিশিষ্ট, একজোড়া টলটলায়মান রক্তমাংসের পা বাতাসের গাত্রে ঝুলিতে দেখেন। কিন্তু কবি যদি কেবল ইশারায় মাত্র ভাব প্রকাশ না করিয়া মাতালের পায়ের উপরেই বেশি ঝোঁক দিতেন, যদি তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট, বাঁ পায়ের ক্ষতচিহ্ন, ডান পায়ের এক হাঁটু কাদার কথার উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্বভাবতই ভাব ও ভঙ্গির সাদৃশ্যটুকু মাত্র মনে আসিত না, সশরীরে এক জোড়া পা আমাদের সম্মুখে আসিয়া তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট লইয়া আস্ফালন করিত। কে না জানেন চন্দ্রানন বলিলে থালার মতো একটা মুখ মনে পড়ে না, অথবা করপদ্ম বলিলে কুঞ্চিত দলবিশিষ্ট গোলাকার পদার্থ মনে আসে না– কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের মতো মুখ ও পদ্মের মতো করতল চিত্রপটে যদি আঁকিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাই যথার্থ মনে করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। “ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ’ ভাষাতে এই বর্ণনা শুনিলে কোনো তর্কবাগীশ একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক মূর্তি কল্পনা করেন না, কিন্তু যদি একটা চিত্রে অথবা মূর্তিতে অবিকল বৃষের ন্যায় স্কন্ধ ও দুইটি শালবৃক্ষের ন্যায় বাহু রচনা করিয়া দেওয়া যায় তবে দর্শক তাহাকেই প্রকৃত না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

আর-একটি কথা। কতকগুলি বিষয় আছে যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য, যাহা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ও করাই উচিত। যেমন, ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। ঈশ্বরের কপালে তিনটে চক্ষু দিলেই যে ইহা আমরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বুঝিতে পারি তাহা নহে। বরঞ্চ তিনটে চক্ষুকে আবার বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হয় ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাষা অলংকারশূন্য। অলংকারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, বিকৃত করিয়া দেয়, মিথ্যা করিয়া দেয়। জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকের দ্বারা বুঝাইতে গেলেই পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে। কবি টেনিসন একটি প্রাচীন ইংরাজি কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। তাহাতে আছে- মহারাজ আর্থরের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া নায়ক লান্‌স্‌লট্‌ কুমারী গিনেবিব্‌কে মহারাজের সহধর্মিণী করিবার জন্য কুমারীর পিতৃভবন হইতে আনিতে গিয়াছেন- কিন্তু সেই কুমারী প্রতিনিধিকেই আর্থর জ্ঞান করিয়া তাঁহাকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করেন; অবশেষে যখন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন আর হৃদয় প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না- এইরূপে এক দারুণ অশুভ পরিণামের সৃষ্টি হইল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধি রূপককে লইয়াও এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকেই জ্ঞানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া লই ও জ্ঞানের পরিবর্তে তাহারই গলে বরমাল্য প্রদান করি- অবশেষে ভ্রম ভাঙিলেও সহজে হৃদয় ফিরাইয়া লইতে পারি না। ইহার পরিণাম শুভ হয় না। কারণ, জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানের প্রতি আমাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না, অথচ অভ্যাস অনুসারে শ্রদ্ধাসূচক অনুষ্ঠানও ছাড়িতে পারি না। এইজন্য তখন টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া হাড়গোড় বাঁকানো ব্যায়াম করিয়া জ্ঞানের প্রতি এই ব্যভিচারকে ন্যায়সংগত বলিয়া কোনোমতে দাঁড় করাইতে চাই। নিজের বুদ্ধির খেলায় নিজে আশ্চর্য হই, সুচতুর ব্যাখ্যার সুচারু ফ্রেমে বাঁধাইয়া ধর্মকে ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখি এবং তাহার চাকচিক্যে পরম পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু এইরূপ ভেল্‌কিবাজির উপরে আত্মার আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা যায় না। ইহাতে কেবল বুদ্ধিই তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু আত্মা প্রতিদিন জড়তা কপটতা, ঘোরতর বৈষয়িকতার রসাতলে তলাইতে থাকে। ইহা তো ধর্মের সহিত চালাকি করিতে যাওয়া। ইহাতে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায়। ইহার আচার্যেরা

অভিমানী উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কারণ ইহাঁরা জানেন ইহাঁরাই ঈশ্বরকে ভাঙিতেছেন ও গড়িতেছেন, ইহাঁরাই ধর্মের সেতু।

জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক ও হানিজনক বটে কিন্তু আমাদের ভাবগম্য বিষয়কে আমরা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, অনেক সময়ে রূপকে ব্যক্ত করিতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিলে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয় না, ইহাতে একটি ঘটনা ব্যক্ত হয় মাত্র; স্থাবর জঙ্গম ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছে আমিও তাঁহার আশ্রয়ে আছি এই কথা বলা হয় মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরের চরণের তলে পড়িয়া আছি বলিলে তবেই আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়– ইহা কেবল আমার সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনসূচক পড়িয়া থাকার ভাব। অতএব ইহাতে কেবল আমারই মনের ভাব প্রকাশ পাইল, ঈশ্বরের চরণ প্রকাশ পাইল না। অতএব ভক্ত যেখানে বলেন, হে ঈশ্বর আমাকে চরণে স্থান দাও, সেখানে তিনি নিজের ইচ্ছাকেই রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন, ঈশ্বরকে রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন না।

যাই হোক, যদি কোনো ব্যক্তি নিতান্তই বলিয়া বসে যে আমি কোনোমতেই গৃহকার্য করিতে পারি না, আমি খেলা করিতেই পারি, তবে আমি তাহার সহিত ঝগড়া করিতে চাই না। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি অন্য পাঁচজনকে বলে গৃহকার্য করা সম্ভব নহে খেলা করাই সম্ভব তখন তাহাকে বলিতে হয় তোমার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া যে সকলের পক্ষেই অসম্ভব সে কথা ঠিক না হইতে পারে। অথবা যদি বলিয়া বসে যে খেলা করা এবং গৃহকার্য করা একই, তবে সে সম্বন্ধে আমার মতভেদ প্রকাশ করিতে হয়। একজন বালিকা যখন পুতুলের বিবাহ দিয়া ঘরকন্নার খেলা খেলে, তখন পুতুলকে সে নিতান্তই মৃৎপিণ্ড মনে করে না– তখন কল্পনার মোহে সে উপস্থিতমতো পুতুল দুটিকে সত্যকার কর্তা-গৃহিণী বলিয়াই মনে করে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহাকে খেলা বলিব না সত্যকার গৃহকার্যই বলিব এমন হইতে পারে না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি যে-সকল বৃত্তি আমাদিগকে গৃহকার্যে প্রবৃত্ত করায় এই খেলাতেও সেই-সকল বৃত্তির অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাও বলিতে পারি খেলা ছাড়িয়া যখন তুমি গৃহকার্যে প্রবৃত্ত

হইবে, তখন তোমার এই-সকল বৃত্তি সার্থক হইবে। আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা এবং ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার চেষ্টা, এ দুইয়ের মধ্যেও সেই গৃহকার্য ও খেলার প্রভেদ। ইহার মধ্যে একটি আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃত কার্য, আত্মার গভীর অভাবের প্রকৃত পরিতৃপ্তিসাধন, আর-একটি তাহার খেলা মাত্র। কিন্তু এই খেলাতেই যদি আমরা জীবন ক্ষেপণ করি তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সকলেই কিছু গৃহকার্য ভালোরূপ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে বলিতে পারি না, তবে তোমরা পুতুল লইয়া খেলা করো। তাহাদিগকে বলিতে হয় তোমরা চেষ্টা করো। যতটা পার তাই ভালো, কারণ ইহা জীবনের কর্তব্য কার্য। ক্রমেই তোমার অধিকতর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও বল লাভ হইবে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে, নতুবা উপাসনা হইলই না, খেলা হইল। ঈশ্বরের ধ্যান করিলে আত্মা চরিতার্থ হয়, কিন্তু এ বিষয়ে সকলে সমান কৃতকার্য হইতে পারেন না, আর রসনাগ্রে সহস্রবার ধ্যানহীন ঈশ্বরের নাম জপ করিলে বিশেষ কোনো ফলই হয় না, অথচ তাহা সকলেরই আয়ত্তাধীন। কিন্তু আয়ত্তাধীন বলিয়াই যে শাস্ত্রের অনুশাসনে, নরকের বিভীষিকায় সেই নিষ্ফল নাম জপ অবলম্বনীয় তাহা নহে।

সীমাবদ্ধ যে-কোনো পদার্থকে আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা বিলাপ থাকিয়া যায় যে তাহাদিগকে আমরা আত্মার মধ্যে পাই না। তাহারা আত্মময় নহে। জড় ব্যবধান মাঝে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। জননী যখন সবলে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরেন তখন তিনি যতটা পারেন ব্যবধান লোপ করিতে চান, কিন্তু সম্পূর্ণ পারেন না এইজন্য সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দূরে রাখি কেন? আমরা নিজে ইচ্ছাপূর্বক স্বহস্তে ব্যবধান রচনা করিয়া দিই কেন? তিনি আত্মার মধ্যেই আছেন আত্মাতেই তাঁহার সহিত মিলন হইতে পারে, তবে কেন আত্মার বাহিরে গিয়া তাঁহাকে শত সহস্র জড়ত্বের আড়ালে খুঁজিয়া বেড়াই? আত্মার বাহিরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আত্মার ভিতরে পাইতে চাই, আর যিনি আত্মার মধ্যেই আছেন তাঁহাকে কেন আত্মার বাহিরে রাখিতে চাই?

নিরাকার উপাসনাবিরোধীদের একটা কথা আছে যে, নিরাকার ঈশ্বর নির্গুণ অতএব তাঁহার উপাসনা সম্ভবে না। আমি দর্শনশাস্ত্রের কিছুই জানি না, সহজ বুদ্ধিতে যাহা মনে হইল তাহাই বলিতেছি। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ কী করিয়া জানিব! তাঁহার অনন্ত স্বরূপ তিনিই জানেন। কিন্তু আমি যখন সগুণ তখন আমার ঈশ্বর সগুণ। আমার সম্বন্ধে তিনি সগুণ ভাবে বিরাজিত। জগতে যাহা-কিছু দেখিতেছি তাহা যে তাহাই, তাহা কী করিয়া জানিব! তাহার নিরপেক্ষ স্বরূপ জানিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই। সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর-কোনো সম্বন্ধ বিচার করিয়া চলিলে আমি মারা পড়িব। হল্যান্ডে সমুদ্রে বন্যা আসিত। তাই বলিয়া কি হল্যান্ড সমুদয় সমুদ্র বাঁধিয়া ফেলিবে! সমুদ্রের যে অংশের সহিত তাহার অব্যবহিত যোগ সেইটুকুর সঙ্গেই তাহার বোঝাপড়া। মনে করুন একটি শিশুর পিতা জমিদার, দোকানদার, ম্যুনিসিপলিটি সভার অধ্যক্ষ, ম্যাজিস্ট্রেট, লেখক, খবরের কাগজের সম্পাদক- তিনি কলিকাতাবাসী, বাঙালি, হিন্দু, ককেশীয় শাখাভুক্ত, আর্যবংশীয়, তিনি মনুষ্য- তিনি অমুকের পিসে, অমুকের মেসো, অমুকের ভাই, অমুকের শ্বশুর, অমুকের প্রভু, অমুকের ভৃত্য, অমুকের শত্রু, অমুকের মিত্র ইত্যাদি- এক কথায়, তিনি যে কত কী তাহার ঠিকানা নাই - কিন্তু শিশুটি তাঁহাকে কেবল তাহার বাবা বলিয়াই জানে (বাবা কাহাকে বলে তাহাও সে ভালো করিয়া জানে না)- শিশুটি কেবল তাঁহাকে তাহার আপনার বলিয়া জানে, ইহাতে ক্ষতি কী! এই শিশু যেমন তাহার পিতাকে জানেও বটে, না জানেও বটে, আমরাও তেমনি ঈশ্বরকে জানিও বটে, না জানিও বটে। আমরা কেবল এই জানি তিনি আমাদের আপনার। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের যাহা উচ্চতম আদর্শ, তাহাই আমাদের পূজার ঈশ্বর, তাহাই আমাদের নেতা ঈশ্বর, তাহাই আমাদের সংসারের ধ্রুবতারা। তাঁহার যাহা নিগূঢ় স্বরূপ তাহার তথ্য কে পাইবে! কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের দেবতা আমাদের মিথ্যা কল্পনা, আমাদের মনগড়া আদর্শ, তাহা নহে। আংশিক গোচরতা যেরূপ সত্য ইহাও সেইরূপ সত্য। পূর্বেই বলিয়াছি দৃষ্টিগোচর সমুদ্রকে সমুদ্র বলা এক আর ডোবাকে সমুদ্র বলা এক। ইহাকে আমি আংশিক বলিয়াই জানি- এইজন্য হৃদয় যতই প্রসারিত করিতেছি, আমার ঈশ্বরকে ততই অধিক করিয়া পাইতেছি- ন্যায়

দয়া প্রেমের আদর্শ আমার যতই বাড়িতেছে ততই ঈশ্বরে আমি অধিকতর ব্যাপ্ত হইতেছি। প্রতি পদক্ষেপে, উন্নতির প্রত্যেক নূতন সোপানে পুরাতন দেবতাকে ভাঙিয়া নূতন দেবতা গড়িতে হইতেছে না। অতএব আইস, অসীমকে পাইবার জন্য আমরা আত্মার সীমা ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া দিই, অসীমকে সীমাবদ্ধ না করি। যদি অসীমকেই সীমাবদ্ধ করি তবে আত্মাকে সীমামুক্ত করিব কী করিয়া। ঈশ্বরকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম জানিয়া আইস আমরা আমাদের জ্ঞান প্রেম দয়াকে বিস্তার করি, তবেই উত্তরোত্তর তাঁহার কাছে যাইতে পারিব। তাঁহাকে যদি ক্ষুদ্র করিয়া দেখি তবে আমরাও ক্ষুদ্র থাকিব, তাঁহাকে যদি মহৎ হইতে মহান বলিয়া জানি তবে আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে ধাবমান হইব। নতুবা পৃথিবীর অসুখ অশান্তি, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বাড়িবে বৈ কমিবে না। সুখ সুখ করিয়া আমরা আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া বেড়াই, আইস আমরা মনের মধ্যে পুরাতন ঋষিদের এই কথা গাঁথিয়া রাখি "ভূমৈব সুখং' ভূমাই সুখস্বরূপ, কোনো সীমা কোনো ক্ষুদ্রত্বে সুখ নাই– তা হইলে অনর্থক পর্যটনের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

ভারতী, শ্রাবণ, ১২৯২

নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা

(উদ্‌বোধন)

গতরাত্রিতে আমরা সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলাম। পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এইজন্য তিনি দীপ্ত ভানুকে নির্বাণ করিয়া দিলেন জগতের কোলাহল থামাইয়া দিলেন। চারি দিক নিস্তব্ধ হইল। বিশ্বচরাচর নিদ্রায় মগ্ন হইল। কেবল একমাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষু বিশ্বজননী শ্রান্ত জগতের শিয়রে বসিয়া অসংখ্য অনিমেষ তারকা-আঁখি তাহার উপর স্থাপিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। দিবসের কঠোর পরিশ্রমে জীবশরীরের যে-কোনো অঙ্গ ব্যথিত হইয়াছিল তাঁহার কোমল কর-সঞ্চালনে সে ব্যথা দূর করিলেন, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় যে মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে অল্পে অল্পে সতেজ করিয়া তুলিলেন– যে আত্মা সংসারের মোহ প্রলোভনে মুহ্যমান হইয়াছিল তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। জগৎ নব-বলে নব-উদ্যমে আবার কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

সেই বিশ্বকর্মা বিশ্ববিধাতার শিল্পাগার চির উন্মুক্ত– দিবারাত্রিই তাঁহার কার্য অবিরামে চলিতেছে। যখন আর সকলেই নিদ্রিত থাকে, সেই বিধাতা পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার রচিত বিশ্বযন্ত্রের জীর্ণসংস্কার করিতে থাকেন– তাঁহার এই সংস্কারকার্য কেমন গোপনে, বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে একটা রহস্যময় আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতে ভালোবাসেন। যতক্ষণ তাঁহার সৃষ্টি জীবন ও সুখসৌন্দর্যে পূর্ণরূপে ভূষিত না হয় ততক্ষণ তিনি তাহাকে বাহিরের পূর্ণ আলোকে আনিতে চাহেন না। সেই মহাশিল্পী সেই মহারহস্যের আবরণ ক্রমশ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য হইতে অভিনব বিচিত্র জীবন-সৌন্দর্যের বিকাশ করিতেছেন। তিনি জরায়ুর অন্ধকারে অবস্থান করিয়া মানবশিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোজনা করেন। তিনি অণ্ডের মধ্যে থাকিয়া পক্ষীশাবকের শরীর গঠন করেন– তিনি বীজকোষে থাকিয়া বৃক্ষলতাকে পরিপুষ্ট করেন। তিনি পুরাতন বর্ষের

গর্ভে নববর্ষের প্রাণ সঞ্চার করেন– তিনি করাল মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃতের আয়োজন করেন। আর সেই মহারাত্রিকে একবার কল্পনার চক্ষে আনয়ন করো– যখন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র কিছুই ছিল না– যখন সেই স্বয়ম্ভূ স্বপ্রকাশ তাঁহার সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রময় আবরণের মধ্যে বিলীন থাকিয়া আপনাকে আপনি বিকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি সৃষ্টি আরম্ভ হইল– প্রাণের স্রোত বহিতে লাগিল– সৌন্দর্যের উৎস উৎসারিত হইল। সেই মহাপ্রাণের বিরাম নাই– জগতের মৃত্যু নাই।– তাহা অস্তিত্বের অবসান নহে তাহা আবরণ মাত্র– তাহা প্রাণের লীন অবস্থা– তাহা নবজীবনের গূঢ় আয়োজন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যু আমাদের জীবনরঙ্গভূমির সজ্জাগৃহ মাত্র। ইহলোকের অভিনয়-মঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়া কিছুকাল আমরা মৃত্যুরূপ সজ্জাগৃহে বিশ্রাম করি ও পুনর্বার নবসাজে সজ্জিত হইয়া জীবনরঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করি ও নব-উদ্যমে পূর্ণ হইয়া জীবনের নূতন অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

বলিতে বলিতে ওই দেখো পূর্ব দিকের যবনিকা অল্পে অল্পে উদ্‌ঘাটিত করিয়া শুভ্রভূষা অকলুষা উষা ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিতেছেন। সুকুমার শিশুর পবিত্র হাসির রেখা দিগন্তের রক্তিম অধরে দেখা দিয়াছে। সুখস্পর্শ প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। উষার চুম্বনে কুসুমরাশি জাগ্রত হইয়া কেমন পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতেছে। বিহঙ্গকুলের মধুর কলরবে আকাশ ছাইয়া গেল। জগৎ, জীবন সুখে পুনর্বার পূর্ণ হইল। এ সেই পবিত্র-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপেরই মহিমা। আইস এই নববর্ষের উৎসবে আমরা তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করি, বর্ষের এই প্রথম দিনে সেই সর্বসিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের রসনাকে পবিত্র করি– এই পবিত্র দিবসে এই পবিত্র প্রাতঃকালে তাঁহারই কার্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,

ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি

(Evolution)

অভিব্যক্তিবাদ বলে একেবারে সম্পূর্ণ আকারে সৃষ্ট না হইয়া নিখিল ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। এককালে মনে হইয়াছিল এই মত ধর্মের মূলে আঘাত করিবে, তাই ধর্মযাজকগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এ মত সহিয়া গেল, সকলে মানিয়া লইল, অথচ ধর্মের মূল অবিচলিত রহিল। লোকে হঠাৎসৃষ্টি অপেক্ষা অমোঘ সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে ঈশ্বরিক ভাব অধিক উপলব্ধি করিতে লাগিল। একদল লোকের বিশ্বাস আমাদের মনের ধর্মভাব, ঈশ্বরধারণা সহজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। আর-একদল লোক বলেন তাহা ভূতের ভয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ অভিব্যক্ত। প্রথমোক্ত দল ভয় করেন যে, শেষ মতটি প্রমাণ হইলে ধর্মের মূলে আঘাত লাগিবে। কিন্তু আমি সেরূপ আশঙ্কা দেখি না। ভূতের ভয় হইতেও যে অসীম ঈশ্বরের ভাব আমাদের মনে বিকশিত হইতে পারে ইহা পরম আশ্চর্য। স্বার্থপরতা হইতে মানবধর্মনীতি ক্রমে নিঃস্বার্থপরতার অভিমুখিন হইতেছে ইহাতেই মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত মঙ্গলনিয়ম অধিক মাত্রায় অনুভব করা যায়। বীজে ও বৃক্ষে যেমন দৃশ্যমান প্রভেদ, এমন আর কিছুতে না, কিন্তু বৃক্ষ হইবার উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে বর্তমান। বাষ্প হইতে সৌরজগতের অভিব্যক্তি বলিলে সৌরজগৎ যে বাষ্পেরই সামিল হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে। ইতিপূর্বে অমঙ্গল ও মঙ্গলকে, শয়তান ও ঈশ্বরকে দুই বিপরীত শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছিল। এখন অভিব্যক্তিবাদ হইতে আমাদের মনে এই ধারণা হইতেছে অসত্য হইতে সত্য অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উদ্‌ভূত হয়। সত্যের নিয়ম মঙ্গলের নিয়ম অসত্য এবং অমঙ্গলের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। অনন্ত জগতের অনন্ত কার্য সমগ্রভাবে দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আংশিকভাবে দেখিতে গিয়া আমরা সকল সময়ে পাপপুণ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না তথাপি মঙ্গল অভিব্যক্তির প্রতি আমাদের এমনি বিশ্বাস যে মন্দের মধ্যে হইতেও ভালো হইবে এই বিশ্বাস অনুসারে উপদেশ দিতে ও কাজ করিতে আমরা কিছুতেই বিরত হই না।

অতএব অভিব্যক্তিবাদে এই মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস আমাদের মনে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেয়, মনে হয় সৃষ্টির [মধ্যে যে] মঙ্গলকার্য দেখিতেছি তাহা সৃষ্টিকর্তার ক্ষণিক খেয়াল নহে, তাহা সৃষ্টির সহিত অবিচ্ছেদ্য অনন্ত নিয়ম।

চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবার চেষ্টাই হিন্দুর বিশেষত্ব এবং সেই বিশেষত্ব একান্ত যত্নে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য, চন্দ্রনাথবাবু এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আমাদের ভিন্নরূপ মানসিক প্রকৃতিতে ভিন্নরূপ ধারণা হওয়ায় "সাধনা'য় চন্দ্রনাথবাবুর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

ইহাতে চন্দ্রনাথবাবু আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার একটা কারণ দেখাইয়াছেন যে, "পূর্ব প্রবন্ধে এ কথা যে রকম করিয়া বুঝাইয়াছি তাহাতেও যদি কেহ না বুঝেন তবে তিনি এ কথা বুঝিতে হয় অসমর্থ না হয় অনিচ্ছুক'_ দৈবাৎ তাঁহারই বুঝাইবার কোনো ত্রুটি ঘটিতেও পারে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, এরূপ সংশয়মাত্র চন্দ্রনাথবাবুর মনে উদয় হইতে পারিল না। অতএব যে দুঃসাহসিক তাঁহার সহিত একমত হইতে পারে নাই সেই নরাধম। যুক্তিটা যদিও তেমন পাকা নহে এবং ইহাতে নম্রতা ও উদারতার কিঞ্চিৎ অভাব প্রকাশ পায়, তথাপি তর্কস্থলে এরূপ যুক্তি অনেকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। চন্দ্রনাথবাবুও যদি সেই পথে যান, তবে আমরা তাঁহাকে মহাজন জানিয়াও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রবন্ধের উপসংহারে চন্দ্রনাথবাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না, স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যেও লোকে পরস্পরকে এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে। অতএব, চন্দ্রনাথবাবু যে বলিয়াছেন ক্ষুদ্রতা হইতে যতই ব্যাপকতার দিকে উত্থান করা যায় ততই তীব্রতা দুর্দমনীয়তার হ্রাস হয়, সে কথা সপ্রমাণ হইতেছে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্য স্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক এবং নব্য গুরুদিগের অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব আমরা সত্যদ্রোহী হওয়াকেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ জ্ঞান করি।

চন্দ্রনাথবাবু যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা আকারে যদিও বৃহৎ কিন্তু তাহার মূল কথা দুটি-একটির অধিক নহে অতএব আসল তর্কটা সংক্ষেপে সারিতে পারিব এরূপ আশা করা যায়।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন, হিন্দুর লয়তত্ত্বের অর্থ সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গেলে যে একেবারেই সংসারে বিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে, বরঞ্চ সংসারধর্ম পালন সেই অবস্থা প্রাপ্তির একটি মুখ্য সোপান। কারণ, যাঁহারা মনে করেন নির্গুণ অবস্থা লাভের অর্থ আত্মনাশ "তাঁহারা বড়ো ভুল বুঝেন–তাঁহারা বোধহয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা বা বিকৃতিবশত আমাদের লয়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ'। তাঁহার মতে নির্গুণতা প্রাপ্তির অর্থ "আত্মসম্প্রসারণ'। স্বার্থপরতা হইতে পরার্থপরতা এবং পরার্থপরতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে ক্রমশ নির্গুণতারূপ আত্মসম্প্রসারণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় মাত্র। অতএব পরার্থপরতার সম্যক্ অভ্যাসের জন্য সংসার-ধর্ম পালন অত্যাবশ্যক। আবার যাঁহারা বলেন, লয়তত্ত্ব মানিয়া চলিতে গেলে বিজ্ঞানশিক্ষা সৌন্দর্যচর্চা দূর করিতে হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কারণ, "পদার্থবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাঘাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিস।' "বিশ্বের সৌন্দর্য, বিশ্বের মাধুরী, বিশ্বের মধুময়তা (এই তিনটি শব্দবিন্যাসের মধ্যে বিশেষ যে অর্থবৈচিত্র্য আছে আমার বোধ হয় না। শ্রীরঃ) ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মচারী যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না।' "প্রকৃত সৌন্দর্যে মানুষকে ব্রহ্মেই মজাইয়া দেয়।'

মোট কথাটা এই। এক্ষণে, যদিও আশঙ্কা আছে আমাদের বুদ্ধিহীনতা অথবা অসারল্য, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা ও বিকৃতি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর প্রত্যয় উত্তরোত্তর অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তথাপি আমাদিগকে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে এবারে আমরা চন্দ্রনাথবাবুর কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সগুণে নির্গুণ এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তোলা পূর্বে আমরা কোথাও দেখি নাই।

প্রথম কথা। ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ বুঝিতে পারি, কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের মধ্যে ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।

যদি কেহ বলেন, অনুরাগের ব্যাপকতা অনুসারে তাহার প্রবলতা ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসে সে কথা প্রামাণ্য নহে। একভাবে হ্রাস হইয়া আর-একভাবে বৃদ্ধি হয়। প্রকৃত দেশানুরাগ যে গৃহানুরাগের অপেক্ষা ক্ষীণবল ইতিহাস এরূপ সাক্ষ্য দেয় না, দেশানুরাগের অপেক্ষা প্রকৃত সর্বজনীন প্রীতি যে নিস্তেজ এমন কথা কাহার সাধ্য বলে! বড়ো বড়ো অনুরাগে একেবারে প্রাণ লইয়া টানাটানি। দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য, ধর্মের জন্য মহাত্মারা যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন তাহা যে কত বড়ো "বিরাট' অনুরাগের বলে, তাহা আমরা ঘরে বসিয়া অনুমান করিতেই পারি না। এই যে অনুরাগের উত্তরোত্তর বিশ্বব্যাপী বিস্তার ইহাকেই কি নির্গুণ লয় বলে? প্রীতি কি কখনো প্রীতিহীনতার দিকে আকৃষ্ট হয়? আত্মপ্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বপ্রেম হইতে সগুণ ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে একটি পরস্পরসংলগ্ন পরিণতির পর্যায় আছে। কিন্তু "হাঁ'-কে বড়ো করিয়া "না' করা যায় এ কথা বিশ্বাস করিতে যেরূপ অসাধারণ মানসিক প্রকৃতির আবশ্যক আমাদের তাহা নাই স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথা। "সৃষ্টিকৌশলের মধ্যে "বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কী করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। "লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? "লীলা' কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? "সৃষ্টিকৌশল' জিনিসটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোনো যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে?

সৌন্দর্যের একমাত্র কার্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন সৃষ্টির সৌন্দর্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালোবাসেন এই সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অমোঘ নিয়মপাশে বাঁধিয়া আমাদিগকে বলপূর্বক কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশ্বের সৌন্দর্যে তিনি আমাদিগকে বংশীস্বরে আহ্বান করিতেছেন– তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণরাধার রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্য ও প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ কি নির্গুণ ব্রহ্ম? চন্দ্রনাথবাবু কী বলিবেন জানি না, কিন্তু চৈতন্যদেব অন্যরূপ বলেন। তিনি অহংব্রহ্মবাদীদিগকে “পাষণ্ড’ বলিয়াছেন। সে যাচাই হৌক, সৌন্দর্য বিরাট লয়প্রার্থীদিগকে যে কী করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে “মজাইতে’ পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেটা আমাদের বুদ্ধির দোষ হইতে পারে এবং সেজন্য চন্দ্রনাথবাবু আমাদিগকে যথেচ্ছা গালি দিবেন, আমরা নির্বোধ ছাত্র-বালকের মতো নতশিরে সহ্য করিব, কিন্তু অবশেষে বুঝাইয়া দিবেন।

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে প্রহ্লাদ ও নারদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল প্রহ্লাদ ও নারদ উভয়েই বৈষ্ণব। উভয়েই ভক্ত এবং প্রেমিক। প্রহ্লাদের কাহিনীতে ঈশ্বরের সগুণতার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে পুরাণের অন্য কোনো কাহিনীতে সেরূপ দেওয়া হয় নাই। প্রকৃত ভক্তির বশে ভক্তের কাছে ঈশ্বর যে কীরূপ প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেন ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যে ঈশ্বর নানা বিপদ হইতে ভক্তকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং অবশেষে নৃসিংহ মূর্তি ধরিয়া দৈত্যকে সংহার করিয়াছেন তিনি কি নির্গুণ ব্রহ্ম?

প্রসঙ্গক্রমে চন্দ্রনাথবাবু বঙ্কিমবাবুকে এক স্থলে সাক্ষ্য মানিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে গুণের আদর্শরূপে খাড়া করিয়া তাঁহারই অনুকরণের জন্য আমাদিগকে

উৎসাহিত করিয়াছেন- নির্গুণতাকে আদর্শ করিয়া অপরূপ পদ্ধতি অনুসারে আত্মসম্প্রসারণ করিতে বলেন নাই।

আসল কথা, যাঁহারা যথার্থ লয়তত্ত্ববাদী, তাঁহারা লয়কে লয়ই বলেন, ইংরাজি শিখিয়া তাহাকে আত্মসম্প্রসারণ বলেন না। তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য কদর্য কিছুই নাই, এইজন্য তাঁহারা অতি কুৎসিত বস্তু ও চন্দনকে সমান জ্ঞান করেন। জগৎ তাঁহাদের কাছে যথার্থই অসৎ মায়া, বিশ্বনাথের সৃষ্টিকৌশল ও লীলা নহে।

মরুভূমি যেমন বিরাট এ তত্ত্বও তেমনি বিরাট, কিন্তু তাই বলিয়া ধরণীর বিচিত্র শস্যক্ষেত্রকে মরুভূমি করা যায় না; অকাতরে আত্মহত্যা করার মধ্যে একটা বিরাটত্ব আছে কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণীদিগকে সেই বিরাটত্বে নিয়োগ করা কোনো জাতিবিশেষের একমাত্র কর্তব্য-কর্ম বলা যায় না। প্রেম প্রবল মোহ, জগৎ প্রকাণ্ড প্রতারণা এবং ঈশ্বর নাস্তিকতার নামান্তর এ কথা বিশ্বাস না করিলেও সংসারে “বিরাটভাব’ চর্চার যথেষ্ট সামগ্রী অবশিষ্ট থাকিবে।

আসল কথা, চন্দ্রনাথবাবু নিজের সহৃদয়তাগুণে লয়তত্ত্ব সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছেন। অথচ সেই সহৃদয়তাই দেশানুরাগের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে লয়তত্ত্বের সর্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রমাণের চেষ্টা করিতেছে। সেই হৃদয়ের প্রাবল্যবশতই তিনি অকস্মাৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদিগকে গালি দিয়াছেন এবং ভরসা করি, সেই সহৃদয়তাগুণেই তিনি আমাদের নানারূপ প্রগল্‌ভতা মার্জনা করিবেন।

সাধনা,আষাঢ়, ১২৯৯

নব্য লয়তত্ত্ব

"সাহিত্যে' চন্দ্রনাথবাবু "লয়' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, আমাদের মতের সহিত অনৈক্য হওয়াতে সাধনা পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনাকালে আমরা ভিন্ন মত ব্যক্ত করি। তাহা লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমাদের বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে, তাহা "সাহিত্য'-পাঠকদিগের অগোচর নাই। বিষয়টা গুরুতর, অতএব এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু উত্তরোত্তর আমাদের প্রতি রাগ করিতেছেন, ইহাতেই আমরা কিছু চিন্তিত হইয়াছি। চন্দ্রনাথবাবুর যে-একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাঁহার মতের সহিত যখন আমাদের বিরোধ তখন অবশ্যই আমরা হিন্দুমতদ্বেষী, এ কথাটা কিছু গুরুতর। তিনি নানা ছলে আমাদিগকে সেইরূপ ভাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া জন্মিলেই যে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত কোনো মতভেদ হইবে না, এমন কথা কী করিয়া বলিব! বিশেষত, ইতিহাসে যখন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ ভক্ত রামপ্রসাদ "লয়তত্ত্ব' সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "চিনি হতে চাই নে রে, ভাই, চিনি খেতে ভালোবাসি!' অর্থাৎ "বিরাট হিন্দু'র "বিরাট লয়' তাঁহার নিকট প্রার্থনীয় নহে, এ কথা তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য অহংব্রহ্মবাদীর প্রতি কীরূপ বিরক্ত ছিলেন, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা ছাড়া ভারতে দ্বৈতবাদী হিন্দুর সংখ্যা বিরল নহে। পূর্বোক্ত হিন্দু মহাপুরুষদিগের সহিত যখন চন্দ্রনাথবাবুর মতের ঐক্য হইতেছে না, তখন ভরসা করি আমার ন্যায় লোকের পক্ষেও তাঁহার সহিত মতবিরোধ প্রকাশ করা নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ হইবে না।

চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সেটাকে আমি তাঁহার স্বরচিত লয়তত্ত্ব বলিয়াছি, ইহাতেই তিনি কিছু অধিক রাগ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। অতএব ও কথাটা ব্যবহার না করিলেই ভালো করিতাম, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা হইলে আমাদের আসল কথাটাই বলা হইত না। শাস্ত্রে যে একটা লয়তত্ত্ব আছে, বিশেষরূপে তাহার প্রমাণ

প্রয়োগ করা বাহুল্য– কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যে শাস্ত্রে নাই, ইহাই আমার বক্তব্য।

এমনতরো স্বতোবিরোধী কথা শাস্ত্রে থাকিবেই বা কী করিয়া? লয় অর্থে আত্মসম্প্রসারণ, নির্গুণ অর্থে সগুণ, এ-সব কথা নূতন ধরনের। প্রথমত, আত্মসম্প্রসারণ বলিতে কাহার প্রসারণ বুঝায়, সেটা ঠিক করা আবশ্যক। ব্রহ্ম তো আছেনই; আমি যদি আপনাকে তাঁহার মধ্যে লুপ্ত করিয়া দিই, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র বৃদ্ধি হইবে না– তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনি থাকিবেন। আর আমি? আমি তখন থাকিব না। কারণ, আমি যদি থাকি তো আমাতে ব্রহ্মেতে ভেদ থাকে; আর আমি যদি না থাকি, তবে সম্প্রসারণ হইল কাহার? ব্রহ্মেরও নহে, আমারও নহে।

প্রকৃত লয়তত্ত্ববাদীগণ আত্মপ্রসারণ নহে, আত্মসংহরণ করিতে উপদেশ দেন। "ইহা নহে' "ইহা নহে' "ইহা নহে' বলিয়া, সমস্ত উপাধি হইতেই তাঁহারা আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া অবশেষে যে আমি ভাবিতেছে তাহাকেও বিলুপ্ত করিয়া দেন; জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-ভেদ দূর করিয়া দেন–

> "নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
> বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।'

তাঁহারা স্পষ্টই বলেন, কর্মের দ্বারা কখনোই এই লয়সাধন হয় না, কারণ কর্ম এবং অবিদ্যা অবিরোধী। কর্ম হইতে কর্ম, অনুরাগ হইতে অনুরাগেই লইয়া যায়। এইজন্য শংকরাচার্য বলেন

> "অবিরোধিতয়া কর্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্তয়েৎ।'

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, সে লয় প্রাপ্তির পক্ষে কর্মসোপান “একান্ত আবশ্যক।’ তাহার কারণ, চন্দ্রনাথবাবু ব্রহ্মকে মুখে বলেন নির্গুণ, ভাবে বলেন সগুণ; মুখে বলেন লয়, কিন্তু তাহার অর্থ করেন সম্প্রসারণ।

আবার বলেন, লয়তত্ত্ববাদীরা “যে জগৎকে অসৎ ও মায়া বলিয়াছেন সে কেবল ব্রহ্মের তুলনায়। নহিলে বলো দেখি কেন তাঁহারা এই অসৎটাকে এত ভয় করিয়া গিয়াছেন!’ অর্থাৎ চন্দ্রনাথবাবুর মতে জগৎটা প্রকৃতপক্ষে অসৎ নহে। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, শুক্তিকাকে যেমন রজত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। মোহমুদ্‌গরের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সকলেরই নিকট সুপরিচিত–

অষ্টকুলাচল সপ্ত সমুদ্রা
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ,
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

তাহা ছাড়া, “তুলনায় মিথ্যা’ বলিলে বিশেষ কিছুই বুঝায় না। মিথ্যা মাত্রেই তুলনায় মিথ্যা। মিথ্যার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত, তবে তো সে সত্যই হইত।

অতঃপর সগুণ নির্গুণ লইয়া তর্ক।

লয়তত্ত্ববাদীরা ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, নির্বিকার, নিরাকার, নিত্য, মুক্ত ও নির্মল বলিয়া থাকেন। এইজন্য ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য তাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন– “ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং।’ অর্থাৎ অনুরাগ ছাড়িয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে ব্রহ্মের অনুরূপ হওয়া যায়।

এদিকে আবার অন্যমতাবলম্বীরা ঈশ্বরকে ভক্তবৎসল বলেন। সে ঈশ্বর উদাসীন নহেন, কারণ তিনি পাপীর প্রতি ভীষণ ও পুণ্যাত্মার প্রতি প্রসন্ন। তিনি দৈত্যকে দলন

করেন ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। তিনি নানা অবতার রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। কেবল যদি তিনি চিদানন্দময় হন, কেবল যদি তাঁহার আপনাতেই আপনার আনন্দ হয়, তাঁহার যদি আর কোনো গুণ, আর কোনো স্বরূপ না থাকে এবং তাঁহার নিকট তিনি ছাড়া আর কিছুই স্থান না পায় (যথা– জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে। চিদানন্দৈকরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি॥), তবে ঈশ্বর রুদ্র, ঈশ্বর দয়াময়, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর ভক্তবৎসল, এ সমস্ত কথাই মিথ্যা।

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু জগৎকে ঈশ্বরের "সৃষ্টিকৌশল' "ভগবানের লীলা' বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এবং ব্যাখ্যা করিবার সময় বলেন, যদি ইহা তাঁহার লীলাই না হইবে, যদি তাঁহার সৃষ্টিই না হইবে, যদি নিতান্ত মায়া এবং অসৎ হইবে, তবে ইহাকে পণ্ডিতেরা কেন এত ভয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন? আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা যদি ভগবানের লীলা হয়, সৃষ্টি হয়, তবেই বা ইহাকে ভয় করিতে হইবে কেন; তাঁহার লীলা কি দানবের লীলা? তাঁহার সৃষ্টি কি শয়তানের সৃষ্টি? জগৎ যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে সে ইচ্ছা কি মঙ্গল ইচ্ছা নহে?

অতএব, যদি বল জগৎ তাঁহার ইচ্ছা নহে জগৎ সত্য নহে, তবেই বুঝিতে পারি মিথ্যা জগৎকে অতিক্রম করিবার জন্য সাধনা কর্তব্য, কিন্তু যদি বল জগৎ তাঁহার লীলা অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা, তবে সে ইচ্ছাকে অবিশ্বাস করিলে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করা হয়।

যাঁহারা প্রথমোক্ত মতাবলম্বী, তাঁহারা জগৎ হইতে জগৎবাসীদের মন ফিরাইবার জন্য ক্রমাগত বিভীষিকা দেখাইয়া থাকেন। জগতের যে অংশ হীন তাহারই প্রতি তাঁহারা ক্রমাগত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এমন-কি, সৌন্দর্যকে কদর্য বীভৎসভাবে আঁকিতেও চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, সংসারে প্রেম কপটতামাত্র; যে পর্যন্ত ধনোপার্জনে শক্তি থাকে, পরিজনগণ সেই পর্যন্তই অনুরাগ দেখায়, জরাজর্জর হইলে কেহ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে না। মানবহৃদয়ে যে অকৃত্রিম মৃত্যুঞ্জয় প্রেম আছে, সে প্রেমের ছবি তাঁহারা গোপন করিয়া যান। তাঁহারা বলেন–

“অয়মবিচারিতচারুতয়া
সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ!’

অর্থাৎ, যে-সকল চারুতা দ্বারা সংসারকে রমণীয় বোধ হয়, সে-সকল চারুতা বিচারের চক্ষে তিরোহিত হইয়া যায়।

এই-সকল লয়তত্ত্ববাদীরা জগতের মধ্য দিয়া আত্মসম্প্রসারণ করিতে চাহেন নাই বলিয়াই, জগৎ হইতে জগৎবাসীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই, জগতের প্রতি বারংবার এত কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। মানবের অকৃত্রিম প্রেমের মধ্যে, বিশ্বজগতের চিরনূতন চারুতার মধ্যে জগদীশ্বরের প্রেম এবং ঐশ্বর্য নির্দেশ করা তাঁহাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধ। কারণ, তাঁহাদের ঈশ্বর নির্গুণ, তাঁহাদের জগৎ মায়া।

কিন্তু বৈষ্ণবেরা জগতের সৌন্দর্যকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে ভীত হন নাই এবং তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমকে মানবপ্রেমের সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাহার কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরকে সুন্দর বলেন, ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ বলেন। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য তাঁহার বংশীধ্বনি, তাঁহার প্রেমসংগীত, আমাদের প্রতি তাঁহার আহ্বান। ভক্ত এবং ঈশ্বর যদি স্বতন্ত্র না থাকেন, তবে এ সৌন্দর্য কিসের সৌন্দর্য, কাহার কাছে সৌন্দর্য! চন্দ্রনাথবাবু যে “বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্যের’ কথা বলিয়াছেন, লয়তত্ত্বে সে সৌন্দর্যের স্থান কোথায়? কারণ, ভেদজ্ঞানমাত্রেই মায়া– ভেদজ্ঞান ব্যতীত সৌন্দর্যের কোনো অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, যেহেতু সৌন্দর্য অনুভবসাপেক্ষ। ঈশ্বরকে যতক্ষণ সুন্দর বলিব, ততক্ষণ ভক্তকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র স্বীকার করা বৈ আর গতি নাই। এইজন্য চন্দ্রনাথবাবু ব্যতীত কোনো লয়তত্ত্ববাদী ব্রহ্মকে সুন্দর বলেন না। তাঁহারা বলেন–

অনণ্‌বস্থূলহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ং।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।

যাহা হউক, চন্দ্রনাথবাবু যাহাকে “বিরাট লয়’ বলেন, তাহা লয় নহে আত্মসম্প্রসারণ, অর্থাৎ লয়ের ঠিক বিপরীত। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, প্রকৃতপক্ষে সগুণ এবং এই জগৎ তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার লীলা। অসৎ জগৎ প্রকৃতপক্ষে অসৎ নহে এবং বহু সাধনার পর চরম জ্ঞান লাভ করিলে একটা বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এরূপ লয়তত্ত্ব যে আমাদের মতের বিরুদ্ধ নহে, তাহা আমাদের প্রতিবাদ পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। কারণ, আত্ম হইতে পর এবং পর হইতে পরমাত্মার প্রতি আত্মার প্রসারণ– এবং জগৎ হইতে জগদীশ্বরের অসীম সৌন্দর্যের উপলব্ধি, বোধ করি, জগতের সমুদায় শ্রেষ্ঠ ধর্মমতেরই লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণ করিয়া স্বার্থপরতার বিনাশ সাধন, বোধ করি, খৃস্টানধর্মেরও উপদেশ। ঈশ্বরচরিত্রকে আদর্শ করিয়া আপন ক্ষুদ্রতা পরিহার করা খৃস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের একটি প্রধান অনুশাসন এবং সকল উন্নত ধর্মশাস্ত্রেই সেই উপদেশ দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু যদি ইহাকে লয়তত্ত্ব নাম দেন তবে তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমরা আপত্তি করিব, বলিব– লয়কে লয় অর্থে ব্যবহার না করিয়া তাহার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করিলে কোনো ফল নাই, বরঞ্চ বিপরীত ফলেরই সম্ভাবনা; অতএব যখন তিনি “আত্মসম্প্রসারণ’-নামক একটি শব্দ রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত শব্দে তাঁহার মনোভাব যথার্থ ব্যক্ত হইতেছে, তখন ওই শব্দটাকেই যথাস্থানে প্রয়োগ করিলে “সাধনা’র সমালোচক এবং “সাহিত্যে’র পাঠকগণকে কোনোরূপ বিভ্রাটে ফেলা হইবে না।

সাহিত্য, ভাদ্র, ১২৯৯

বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা

বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে জর্মন অধ্যাপক ডাক্তার পৌল্ ডয়সেন্ সাহেবের মত “সাধনা’র পাঠকদিগের নিমিত্ত নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক ভারতবর্ষে অধিকাংশ প্রাচীন দর্শনের কেবল ঐতিহাসিক গৌরব আছে মাত্র। যথার্থ সাংখ্যমতাবলম্বী অল্পই দেখা যায়; ন্যায় শুদ্ধমাত্র ব্যাকরণ এবং অঙ্কশাস্ত্রের মতো বুদ্ধির চর্চা এবং কৌশল প্রকাশে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত এখনো প্রত্যেক চিন্তাপরায়ণ হিন্দুর হৃদয় মন জীবন্তভাবে অধিকার করিয়া আছে। যদিচ রামানুজ, মাধ্ব এবং বল্লভ-কর্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈত নামে বেদান্তদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর প্রচলিত হইয়াছে তথাপি এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বৈদান্তিকদের মধ্যে বারো-আনা অংশই শংকরাচার্যের অনুগামী।

অধ্যাপক মহাশয়ের মতে দরিদ্র ভারতবর্ষের বিপুল দুর্ভাগ্যের মধ্যে ইহাই একটি মহৎ সান্ত্বনার কারণ। কারণ অনিত্য বিষয়ের অপেক্ষা নিত্য বিষয়ের গৌরব অধিক; এবং পৃথিবীতে নিত্য সত্য অন্বেষণ-চেষ্টায় মানবের প্রতিভা যত কিছু অমূল্যতম পদার্থ সঞ্চয় করিয়াছে শংকরাচার্যের বেদান্তভাষ্য তাহার অন্যতম; উহা প্লেটো এবং কান্টের রচনার সহিত তুলনীয়।

শংকর উপনিষদকে ধ্রুব প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য উপনিষদের নানা বিরুদ্ধ মতের সমন্বয়সাধনপূর্বক তাহা হইতে একটি আদ্যোপান্ত সুসংগত দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করা সহজ ব্যাপার হয় নাই। উপনিষদের স্থানে স্থানে ব্রহ্মকে নানাপ্রকারে রঞ্জিত করা হইয়াছে আবার তিনি অনির্বচনীয় ও মনের অগম্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন- কোথাও বা ব্রহ্ম কীরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন তাহার দীর্ঘ বিবরণ পাঠ করা যায় আবার কোথাও বা ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্তই মায়া ইহাও কথিত হইয়াছে। কোথাও বা আত্মার

সংসারভ্রমণের বিচিত্র কল্পনা দৃষ্ট হয়, আবার কোথাও বা উক্ত হইয়াছে আত্মা কেবল একমাত্র।

শংকর এই-সকল বিরুদ্ধ বচনের মধ্য হইতে আশ্চর্য নৈপুণ্যসহকারে পথ কাটিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি উপনিষদের সমস্ত উক্তি হইতে দুইটি শাস্ত্র গঠন করিয়াছেন– একটি কেবল নিগূঢ় দার্শনিক, ইংরাজিতে যাহাকে esoteric কহে, শংকর যাহাকে কখনো বা সগুণা বিদ্যা কখনো বা পারমার্থিকা অবস্থা কহিয়াছেন; ইহার মধ্যে সেই তত্ত্বজ্ঞানের কথা আছে যাহা সর্বদেশে এবং সর্বকালেই অতি অল্পসংখ্যক লোকের ধারণাগম্য। দ্বিতীয়টি সাধারণ ধর্মতত্ত্ব, শংকর ইহাকে সগুণা বিদ্যা, ব্যবহারিকী অবস্থা কহিয়াছেন; ইহা সর্বসাধারণের জন্য, যাহারা রূপ চাহে স্বরূপ সত্য চাহে না, পূজা করে ধ্যান করে না!

অধ্যাপক মহাশয় এই দুইটি, এক্সোটেরিক্ এবং এসোটেরিক্– ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বিদ্যাকে চারি প্রধান অংশে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন।

প্রথম।	ব্রহ্মতত্ত্ব	Theology
দ্বিতীয়।	জগতত্ত্ব	Cosmology
তৃতীয়।	অধ্যাত্মতত্ত্ব	Psychology
চতুর্থ।	পরকালতত্ত্ব	Eschatology

১। ব্রহ্মতত্ত্ব

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নানা বিরুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়। তিনি সর্বব্যাপী আকাশ, তিনি সূর্যমধ্যস্থ দেবতা, তিনি চক্ষুরন্তর্গত পুরুষ; দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ; তিনি জগদাত্মারূপে

মহত্তোমহীয়ান এবং জীবাত্মা-রূপে অণোরণীয়ান্; তিনি বিশেষরূপে ঈশ্বর, মনুষ্যকৃত পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কারবিধাতা।

শংকর এই-সমস্ত বর্ণনাকে তাঁহার সগুণা বিদ্যার মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা নহে,ভক্তির দ্বারা নিত্য-সত্যের নিকটবর্তী হইবার জন্য এই-সকল বিদ্যা উপযোগী, এবং ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ফল আছে। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন যে, লক্ষ করিয়া দেখা আবশ্যক, ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে বর্ণন সেও সগুণা বিদ্যার অন্তর্গত, সেও সাধারণের জন্য, তাহাতে পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পায় না; বস্তুত যখন বিবেচনা করিয়া দেখা যায় গুণ (personality)বলিতে কী বুঝায়, তাহার সীমা কতই সংকীর্ণ, তাহা অহংকারের সহিত কত নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট, তখন ব্রহ্মের প্রতি গুণের আরোপ করিয়া তাঁহাকে খর্ব করিতে কে ইচ্ছা করিবে?

এই সগুণা বিদ্যার সহিত পরমাত্মার নির্গুণ বিদ্যার সম্পূর্ণ প্রভেদ। ব্রহ্ম মনুষ্যের বাক্যমনের অতীত ইহাই তাহার মূল সূত্র।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

পুনশ্চ

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।

পুনশ্চ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ-ধৃত নেতি নেতি। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে যত প্রকার চেষ্টা কর এবং তাঁহাকে বর্ণনা করিতে যে-কেনো বাক্য প্রয়োগ কর, তাহার উত্তর, ইহা নহে, ইহা নহে। সেইজন্য রাজা বাষ্কলি যখন বাহ্ব ঋষিকে ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলে তিনি কহিলেন, আমি বলিলাম, কিন্তু তুমি বুঝিলে না শান্তোহয়মাত্মা, পরমাত্মা শান্ত। আমরাও এক্ষণে কান্টের শিক্ষামতো জানিয়াছি যে, আমাদের মনের প্রকৃতিই এমন যে কিছুতেই আমরা দেশকাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত সত্তাকে জানিতে পারি না। অথচ তিনি আমাদের

অপ্রাপ্য নহেন তিনি আমাদের হইতে দূরে নাই, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে সমগ্রত আমাদের আত্মারূপেই রহিয়াছেন। এবং আমরা যখন বহির্দেশ হইতে, এই প্রতীয়মান জগৎসংসার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরের গভীরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করি সেখানে ব্রহ্মে আসিয়া উপনীত হই জ্ঞানের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা, আপনার মধ্যে আপনার সংহরণের দ্বারা। [১] জ্ঞানে এবং অনুভবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকে পরন্তু অনুভবে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া যায়। অনুভবের দ্বারা আমি ব্রহ্ম এই ধারণা লাভ করার অবস্থাকে শংকর “সম্রাধন’ কহিয়াছেন।

[১] এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, ইংরাজি knowledge শব্দ জ্ঞান অর্থে এখানে অনুবাদ করিলাম। অনুবাদক

২। জগত্তত্ত্ব

জগত্তত্ত্বেরও দুই বিভাগ আছে, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। ব্যবহারিক বিদ্যায় জগৎকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-কর্তৃক তাহার সৃষ্টিকাহিনী বিচিত্র কল্পনা-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু অনন্তকাল অনর্থক যাপন করিয়া সহসা কালের একটি বিশেষ অংশে অবস্তু কারণের দ্বারা বস্তু-জগতের সৃষ্টি কেবল যে যুক্তি এবং বিজ্ঞানের বিরোধী তাহা নহে তাহা বেদান্তের একটি প্রধান মতের বিপরীত, যে মতে আমাদিগকে “সংসারস্য অনাদিত্বম্’ জন্ম-মৃত্যুর অনাদি স্বভাব শিক্ষা দিয়া থাকে। শংকরাচার্য সুন্দর কৌশলে এই বিরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সৃষ্টি কেবল একবার হয় নাই, অনন্তকাল যাবৎ ব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে এবং লয় পাইতেছে। কোনো সৃষ্টিকেই আমরা আদি সৃষ্টি বলিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে ব্রহ্ম কেন সৃষ্টি করিলেন? তাঁহার নিজের গৌরব প্রচারের জন্য? এরূপ অহংকার তাঁহাতে আরোপ করা সংগত নহে। তাঁহার নিজের খেলার জন্য? কিন্তু অনন্তকাল তো তিনি এই খেলনকব্যতীত যাপন করিয়াছেন। জীবনের

প্রতি প্রীতি প্রযুক্ত? কিন্তু জীবসৃষ্টির পূর্বে তাহার প্রতি প্রীতি কীরূপে সম্ভব হইবে, এবং অসংখ্য জীবকে সৃষ্টি করিয়া অনন্ত দুঃখে নিমগ্ন করার মধ্যে প্রীতির লক্ষণ কি দেখা যায়? ব্যবহারিক বেদান্ত পুনঃপুনঃ-জগৎসৃষ্টির একটি ধর্মনিয়মগত আবশ্যকতা (moral necessity) দেখাইয়া এই-সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শংকর কহেন মনুষ্য উদ্ভিদের ন্যায়। অল্পে অল্পে বর্ধিত হইয়া অবশেষে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মরে না। শস্যের চারা যেমন মরিবার পূর্বে বীজ রাখিয়া যায় এবং সেই বীজ আপন গুণানুসারে নূতন চারা উৎপন্ন করে, তেমনি মনুষ্য মৃত্যুকালে আপন কর্ম রাখিয়া যায়, সেই কর্ম পরজন্মে অঙ্কুরিত হইয়া দণ্ডপুরস্কার বহন করে। কোনো জন্ম প্রথম নহে কারণ তাহা পূর্ববর্তী কর্মের ফল, এবং শেষ নহে কারণ তাহার কর্ম পরবর্তী জন্মে ফলিত হইবে। অতএব সংসার অনাদি অনন্ত এবং প্রলয়ের পরে জগতের পুনঃসৃজন ধর্মনিয়মানুসারে আবশ্যক।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, শাস্ত্রোল্লিখিত এই সংসার যদিচ পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাহা সত্যের কাল্পনিক ছবি। কারণ, সত্যকে স্বরূপভাবে আমরা বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। এই পুনঃপুনঃ-জন্মমৃত্যুবাদকে কাল্পনিক কেন বলিতেছেন? না, যাহা যথার্থত দেশকালের অতীত সুতরাং আমাদের বুদ্ধির অগম্য তাহাকে দেশকালের ছাঁচে ঢালিয়া দেখানো হইতেছে। নির্গুণ বিদ্যা হইতে সগুণ বিদ্যা যত দূরে, সত্য হইতে এই সংসার তত দূরে। অর্থাৎ ইহার মধ্যে অনন্ত সত্য আছে বটে কিন্তু তাহা সত্যের রূপকমাত্র, যেহেতু রূপকব্যতীত মনুষ্যবুদ্ধিতে সত্যের ধারণা হইতেই পারে না। ব্যবহারিক বেদান্ত এই রূপক লইয়া এবং পারমার্থিক বেদান্ত রূপগুণাতীত বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত।

পারমার্থিক বিদ্যা কহিতেছেন, যাহাকে আমরা জগৎ বলি তাহা মৃগতৃষ্ণিকাবৎ মায়ামাত্র, নিকটে আসিলেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই। জগৎ যে মায়ামাত্র তাহা তর্কের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা জানা যায়। নিজের আত্মগুহায় প্রবেশ

করিয়া যখন দেশকালাতীত নির্বিকার শুদ্ধসত্যের অনুভব হয় তখন তদ্‌ব্যতীত আর সমস্তই স্বপ্নরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় মনস্বীগণ এই পথে গিয়াছিলেন এবং গ্রীসীয় তত্ত্বজ্ঞানী প্লেটো, তিনিও এই সত্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তিনিও বলিয়া গিয়াছেন, জগৎ ছায়ামাত্র এবং সত্য ইহার অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে। প্লেটো এবং বৈদান্তিক উভয়ের মতের আশ্চর্য ঐক্য আছে কিন্তু উভয়েই কেবল আত্মপ্রত্যয়দ্বারা এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন আপন মত কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইস্থানে জর্মন পণ্ডিত কান্ট আসিয়া গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় দর্শনের অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। কান্ট বৈদান্তিক ও প্লাটোনিক আত্মপ্রত্যয়ের পথ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মানবমনকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কান্ট দেখাইয়াছেন যে, বাহ্য জগতের তিন মূল পদার্থ দেশ, কাল এবং কার্যকারণসম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে বাহ্যসত্তার অনাদি অনন্ত ভিত্তিভূমি নহে, তাহা আমাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির ছাঁচ মাত্র। তাহা বাহিরে নাই আমাদের মনে আছে ইহা কান্ট এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য শোপেনহৌয়ার পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমরা এই যে জগৎকে দেশে ব্যাপ্ত, কালে প্রবাহিত এবং কার্যকারণ-সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখিতেছি তাঁহাদের মতে ইহা কেবল আমার মনের কার্য মাত্র। শংকর কহেন, জগৎ মায়া; প্লেটো কহেন জগৎ ছায়া; কান্ট কহেন, জগৎ আমাদের মনের প্রতীতি মাত্র সত্য পদার্থ নহে। পৃথিবীর তিন বিভিন্ন প্রদেশে এই এক মত দেখা দিয়াছে কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কেবল কান্ট-দর্শনের মধ্যেই আছে।

৩। অধ্যাত্মতত্ত্ব

সকলই মায়া, কেবল আমার আত্মা মায়া হইতে পারে না। শংকরাচার্য দেখাইয়াছেন আপনাকে অস্বীকার করিতে গেলেও স্বীকার না করিয়া থাকিবার জো নাই। এক্ষণে প্রশ্ন এই, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কী। তাঁহার পরবর্তী রামানুজ, মাধ্ব এবং বল্লভের মত শংকর পূর্বে হইতেই খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। জীব ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না কারণ

ব্রহ্ম অংশরহিত (অংশ বলিতে হয় কালের পর্যায়, নয় দেশের সংস্থান বুঝায়)। জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কারণ আমরা অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। জীব ব্রহ্মের বিকার হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম নির্বিকার (কান্টের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত)। সিদ্ধান্ত এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশও নহে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রও নহে, ব্রহ্মের বিকারও নহে– পরন্তু সম্পূর্ণতা স্বয়ং পরমাত্মা। এই সিদ্ধান্তে বেদান্তবাদী শংকর, প্লেটো-দর্শনবাদী প্লোটিনোস্ এবং কান্ট-দর্শনবাদী শোপেনহৌয়ার ঐক্য লাভ করিয়াছেন। শংকর অপর দুই দার্শনিক হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি কহেন আমার আত্মাই যদি স্বয়ং ব্রহ্ম হইল তবে সুতরাং সর্বব্যাপকতা, নিত্যতা এবং সর্বশক্তিমত্তাও আমার আছে। (অর্থাৎ, আমি দেশকাল এবং কার্যকারণবন্ধনের অতীত।) শংকর কহেন, যেমন, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি গোপন থাকে তেমনি এ-সকল শক্তিও আমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, মুক্তির পরে তাহার প্রকাশ হয়।

কেনই বা প্রচ্ছন্ন থাকে?

শংকর কহেন উপাধি-সকল তাহার কারণ।

উপাধি কী কী? না, মন এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং তাহার পঞ্চ শাখা, এবং সূক্ষ্ম শরীর। ইহারাই জন্মে জন্মে আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে।

উপাধিত্রয় কোথা হইতে আসিল? মায়া হইতে। আবার মায়ার উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে। কিন্তু এই যে আমাদের অজ্ঞান, পাপ এবং দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা, ইহার কারণ কী? ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ইহার সদুত্তর দেন নাই। কান্ট কহিতেছেন, তুমি অবিদ্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? অবিদ্যার কারণ থাকিতেই পারে না। যেহেতু এই সংসারের মধ্যেই কার্যকারণসূত্রের অবসান– সংসারের বাহিরে কার্যকারণের শাসন নাই– অতএব

অবিদ্যার কারণ অনুসন্ধান বৃথা। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, এই দুঃখ পাপ অজ্ঞান হইতে আমাদের মুক্তিপথ আছে। [২]

৪। পরকালতত্ত্ব

এক্ষণে, সংসার হইতে যে মুক্তির পথ আছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাউক।

বেদের প্রাচীন শ্লোকে প্রথমে স্বর্গ এবং পরে নরকের কথা আছে কিন্তু সংসারবাদ অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ কোথাও দেখা যায় না।

বেদান্তে স্বর্গনরক ভোগ এবং পুনর্জন্ম উভয় মতই মিশ্রিত হইয়াছে। বেদান্তের মতে পুণ্যকারীগণ পিতৃযান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশ চন্দ্রলোকে গমন করেন সেখানে আপন সৎকর্মের ফল নিঃশেষ করিয়া পুনশ্চ মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর ব্রহ্মলোকে গমন করেন, পৃথিবীতে তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা যে-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন তিনি সগুণ ব্রহ্ম এবং এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসকেরা যদিচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না তথাপি তাঁহাদিগকে সম্যক্‌দর্শন অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান লাভের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। এতদ্‌ব্যতীত পাপকারীদের জন্য নরক যন্ত্রণা এবং তদবসানে বারংবার নীচজন্মভোগ বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু এই জগৎ এবং সংসার কেবল তাহাদেরই পক্ষে সত্য যাহারা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন। যাহারা অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের পক্ষে নহে।

পারমার্থিক বেদান্তমতে এই জগৎ এবং সংসার কিছুই সত্য নহে, সত্য কেবল ব্রহ্ম যিনি আমাদের আত্মারূপে উপলব্ধ হন। “আমিই ব্রহ্ম’ এই জ্ঞানের দ্বারায় যে মোক্ষ লাভ হয় তাহা নহে, এই জ্ঞানই মোক্ষ।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে।

যখন শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট সর্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায় তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্বসংশয় দূর হয় এবং সকল কর্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।

[২] শঙ্করাচার্য কহিতেছেন – অজ্ঞানং কেন ভবতিচিতেত ? ন কেনাপি ভবতীতি। জ্ঞানমনাদ্যনির্বচনীয়ং। অজ্ঞান কাহা হইতে হয়? কাহা হইতেও হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্বচনীয়। – অনুবাদক

নিঃসন্দেহ কোনো লোক কর্ম ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, জীবন্মুক্তও নহে। কিন্তু তিনি জানেন যে, সকল কর্মই মায়াময় এইজন্য কর্মে তাঁহার আসক্তি থাকে না এবং সেই আসক্তিহীন কর্ম মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের কারণ হইতে পারে না।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, লোকে বেদান্তকে ধর্মনীতিঅংশে অঙ্গহীন বলিয়া দোষ দিয়া থাকে। বাস্তবিকও ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কর্ম অপেক্ষা ধ্যানের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী। কিন্তু তথাপি তাঁহার মতে উচ্চতম এবং বিশুদ্ধতম ধর্মনীতিজ্ঞান বেদান্ত হইতে প্রসূত হইয়া থাকে। প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসা বাইবেলের মতে সর্বোচ্চ ধর্মনীতি– এবং কথাটিও সত্য বটে। কিন্তু যখন আমি সমস্ত সুখ-দুঃখ নিজের মধ্যেই অনুভব করি প্রতিবেশীর মধ্যে করি না তখন প্রতিবেশীকে কেনই বা নিজের মতো ভালোবাসিব? বাইবেলে ইহার কোনো উত্তর নাই, কিন্তু বেদের একটি কথায় ইহার উত্তর আছেড্ডতত্ত্বমসি– তুমিও সে। বেদ বলেন তুমি ভ্রমক্রমে আপনাকে প্রতিবেশী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জান, কিন্তু তোমরা এক। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন– যিনি আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন তিনি ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং, আপনার দ্বারা আপনাকে হিংসা করেন না। ইহাই সমস্ত ধর্মনীতির সার কথা এবং ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতিষ্ঠাস্থল। তিনি আপনাকেই সর্ব বলিয়া জানেন এইজন্য কিছু প্রার্থনা করেন না; তিনি আপনাতেই সমস্ত উপলব্ধি করেন এইজন্য কাহারও ক্ষতি করেন না, তিনি মায়া দ্বারা পরিবৃত হইয়া জগতে বাস

করেন অথচ মুগ্ধ হন না। অবশেষে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাঁহার পক্ষে আর সংসার থাকে না; ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। তিনি ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যোতি। তিনি নদীর ন্যায় ব্রহ্মসমুদ্রে প্রবেশ করেন।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্র
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

এই যে মিলন ইহা অনন্ত সমুদ্রে জলবিন্দুর মিলনের ন্যায় নহে; এ যেন অনন্ত সমুদ্র তুষারবন্ধন মোচন করিয়া আপন সেই সর্বব্যাপী নিত্য এবং সর্বক্ষমস্বরূপে প্রত্যাগমন করিল, যথার্থত যে স্বরূপ তাহার চিরকাল আছে এবং কোনো কালেই দূর হয় নাই।

অনুবাদকের প্রশ্ন

অধ্যাপক ডয়সেন্ বেদান্তমতের যে সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উপরে প্রকাশিত হইল।

আমরা অনেক সময় এক রহস্যের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যে অন্য রহস্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করি।

ডয়সেন্ সাহেব বেদান্তমত অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নির্বিকার ব্রহ্ম-কর্তৃক সৃষ্টি এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মে ও জীবে বিভাগ কল্পনা করা মানবযুক্তির বিরোধী। সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বেদান্ত বলেন যে, জগৎ নাই এবং ব্রহ্মে এবং জীবে যে প্রভেদ প্রতীয়মান হয় তাহা ভ্রম মাত্র তখন মানবের মনে যে সহজ দুই-একটি প্রশ্ন উদয় হয়, তাহার পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন। ভ্রম কাহার?

উত্তর। জীবের।

ইহাকে মীমাংসা বলে না। কারণ, জীবের ভ্রমে জীব হইতে পারে না।

শংকর কহেন, স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর নামক উপাধিত্রয়ের দ্বারা আবৃত হওয়াতেই আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু এই শরীর পরিগ্রহ কোথা হইতে হইল? শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি?

শংকরাচার্যই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন।

কর্মণা। কর্ম দ্বারা শরীর পরিগ্রহ হয়।

কর্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ? কর্মই বা কিসের দ্বারা হয়?

রাগাদিভ্যঃ। রাগ প্রভৃতি হইতে।

রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ? রাগাদি কী করিয়া হয়?

অভিমানাৎ। অভিমান হইতে।

অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অভিমান কী জন্য হয়?

অবিবেকাৎ। অবিবেক হইতে।

অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অবিবেক কী নিমিত্ত হয়?

অজ্ঞনাৎ। অজ্ঞান হইতে।

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? অজ্ঞান কাহার দ্বারা হয়?

ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্বচনীয়ম্। কাহার দ্বারাই হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্বচনীয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে উপাধিপরিগ্রহ দ্বারা জীবব্রহ্মে ভেদজ্ঞান হইবার পূর্বকারণ অজ্ঞান, অবিদ্যা।

অজ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা মনে করিতে পারি না; তাহা কাহাকেও অবলম্বন করিয়া আছে। সে অজ্ঞান যদি ব্রহ্মের হয় তবে ব্রহ্মকে নিরঞ্জন নির্বিকার বলা যায় না। যদি তাহার পৃথক অনাদি অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান এই দুই অস্তিত্ব মানিতে হয়। তবে ওটা কেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অব্রহ্মের পৃথক অস্তিত্ব ভিন্ন নামে স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মও অনাদি অনির্বচনীয় এবং অজ্ঞানও অনাদি অনির্বচনীয়, অথচ ব্রহ্মই অজ্ঞান নহেন এবং অজ্ঞান ব্রহ্মে নাই। ইহা স্বীকার করা যদি সহজ হয় তবে জীব এবং ব্রহ্ম, জগৎ এবং ঈশ্বর, বিভিন্নরূপে স্বীকার করাও সহজ।

বেদান্তশাস্ত্রে জগৎভ্রমের যতগুলি উপমা দেওয়া হইয়াছে সমস্তই দ্বৈতমূলক। শুক্তিতে মুক্তাভ্রম। এ ভ্রম ঘটিতে অন্যূন তিনটি পদার্থের আবশ্যক হয়– শুক্তি এবং মুক্তা এবং ভ্রান্ত ব্যক্তি। মৃগতৃষ্ণিকাও এইরূপ। যাহাকে ভ্রম করা যায়, যাহা বলিয়া ভ্রম করা যায় এবং যে ভ্রম করে এই তিন ব্যতীত ভ্রম কীরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমরা কিছুতেই কল্পনা করিতে পারি না!

ডয়সেন্ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের শেষে যে তুলনা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই তুলনার দ্বারাই কথাটার আত্মবিরোধ প্রকাশ পায়। মূলের ভাষা উদ্‌বৃত করা উচিত।

It is not the falling of the drop into the infinite ocean, it is the whole ocean, becoming free from the fetters of ice, returning from its frozen state to that what it is really and has never ceased to be, to its own all-pervading, eternal, almighty nature।

বস্তুত ইহার অর্থ এই যে, নদী সমুদ্রে পড়িতেছে এ কথা বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে ভেদ স্বীকার করা হয়; কঠিন সমুদ্র গলিয়া স্বাভাবিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল তাহাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে স্বরূপের বিক্রিয়া স্বীকার করা হয়- বলিতে হয় সমুদ্র যাহা আছে যাহা ছিল তাহাই রহিল। কিন্তু ইহাতেও অর্থ পাওয়া যায় না, কারণ পূর্বে বলা হইতেছিল জীবন্মুক্ত যখন মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহার কী দশা হয়- তিনি নদীর মতো সমুদ্রে পড়েন অথবা কঠিনাবস্থাপ্রাপ্ত সমুদ্রের ন্যায় গ্রীষ্মোত্তাপে গলিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন? তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, যে জীবের মৃত্যুর কথা হইতেছিল সে জীব ছিল না এবং তাঁহার মৃত্যুও হয় নাই। তবে, সে জীব ছিল এ কথা উঠে কোথা হইতে? ভ্রম হইতে। কাহার ভ্রম? যদি ব্রহ্মের ভ্রম হয় তবে তো যথার্থই তাঁহার বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তর, ভ্রম বটে কিন্তু কাহারও ভ্রম নহে! সে স্বতই ভ্রম, সে অনাদি অনির্বচনীয়!

স্বীকার করিতে হয় যে, যদি দ্বৈতবাদ অবলম্বন করা যায় তাহা হইলেও মূলরহস্যের আবর্তমধ্যে বুদ্ধিতরণী হইয়া গেলেই এইরূপ গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু যখন কোনো অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদকে যুক্তির বিরোধী বলিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকেও কৈফিয়তের দায়িক না করিয়া থাকা যায় না। বোধ করি, অধ্যাত্মরাজ্যের মূল প্রদেশে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের কোনো এক আশ্চর্য সমন্বয় আছে যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকট রহস্যাচ্ছন্ন। সেখানে বোধ করি অঙ্ক এবং যুক্তিশাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া একেকে দুই বলা যায় এবং দুইকে এক বলিলেও অর্থের বিরোধ হয় না।

বেদান্তের ধর্মনীতিবিষয়ে ডয়সেন্ সাহেব যে কথা- কয়েকটি বলিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেও আমাদের প্রশ্ন আছে।

ডয়সেন্ কহেন, পুনঃপুনঃ জন্মমরণ ও জগৎসৃষ্টির একটি moral necessity অর্থাৎ ধর্মনিয়মগত আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বহনের জন্য জন্মলাভ অনন্তধর্মনিয়মের অবশ্যম্ভব বিধান। কর্মফল ফলিতেই হইবে।

কিন্তু অদ্বৈতবাদে ধর্মনিয়মের অবশ্যম্ভবতার কোনো অর্থ নাই। যেখানে এক ছাড়া দুই নাই সেখানে “মরল্’ বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না।

শংকরাচার্যের আত্মানাত্মবিবেক গ্রন্থ হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে, কর্ম অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞান অনাদি। অজ্ঞান নামক এক অনির্বচনীয় পদার্থ হইতে কর্ম নামক এক অনির্বচনীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া আমাদের শরীর গ্রহণের কারণ হইয়াছে এবং সেই অনির্বচনীয় পদার্থের ফলস্বরূপে আমরা শরীরধারীগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও দুঃখ ভোগ করিতেছি ইহাকে যে-কোনো নিয়ম বলা যাক ধর্মনিয়ম বলিবার কোনো হেতু দেখি না। প্রথমত, অজ্ঞান বলিতে কী বুঝায় আমরা জানি না এবং জানিতেও পারি না, কারণ তাহা অনির্বচনীয়। (তবে যে কেন তাহাকে অজ্ঞান নাম দেওয়া হইল বলা কঠিন; কারণ, উক্ত শব্দে একটা নির্বচন প্রকাশ পায়।) দ্বিতীয়ত, তাহা হইতে কর্ম হইল বলিতে যে কী বুঝায় আমাদের বলা অসাধ্য, কারণ আমরা কর্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা নাই। অবশেষে আরও কতকগুলি নিরালম্ব গুণপরম্পরা হইতে শরীরী জীবের জন্ম হইল। এ-সকল কথা বলাও যা আর শরীরের প্রথম সৃষ্টি কী করিয়া হইল তাহা বলিতে পারি না এবং যদি কেহ বলিতে পারিত তথাপি আমরা বুঝিতে পারিতাম না এ কথা বলাও তা বরঞ্চ শেষোক্ত কথাটা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ ও সরল।

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বেদান্ত যেমন আমাদের শরীর পরিগ্রহের কোনো জ্ঞানগম্য কারণ দেখাইতেছেন না, তেমনি আমাদের দুঃখভোগেরও কোনো কারণ নির্ণয়

করিতেছেন না। যেহেতু, কর্ম নামক কোনো অনির্বচনীয় পদার্থকে আমাদের দুঃখভোগের কারণ বলাও যা, আর আমাদের দুঃখভোগের কারণ জানি না বলাও তা।

বেদব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে এ তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে কর্মের বিভাগ ছিল না এ কথা বলা যায় না যেহেতু কর্ম এবং সৃষ্টি কার্যকারণরূপে অনাদি। যেমন বীজ ও বৃক্ষ। বীজও বৃক্ষের কারণ এবং বৃক্ষ ও বীজের কারণ এইভাবে কোনো কালেও কাহারও আদি পাওয়া যায় না।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কর্মের ফল সৃষ্টি এবং সৃষ্টির ফল কর্ম ইহার আর শেষ নাই। বোধ করি এ স্থলে কর্ম বলিতে যাহা বুঝায় ইংরাজি ফোর্স্‌ বলিতেও তাহা বুঝায়- অর্থাৎ এমন একটা- কিছু বুঝায় যাহা আমরা ঠিক বুঝি না অথচ বুদ্ধিগম্য একটা ছবির আভাস আমাদের মনে আসে, কিন্তু সেটা মিলাইয়া দেখিতে গেলে মিলাইতে পারি না।

তথাপি যেমন করিয়াই দেখি এবং বেদান্তশাস্ত্রে যেমন ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় শেষকালে দাঁড়ায় এই যে, আমরা কেন হইয়াছি এ প্রশ্নের কোনো অর্থ নাই। আমরা হইয়াছি- আমাদের হওয়াটা অনাদি। এবং হওয়াটিই দুঃখভোগের কারণ- সুতরাং কেন দুঃখভোগ করিতেছি তাহারও কোনো কেনত্ব নাই। অতএব এ স্থলে “মরল্‌’ অথবা অন্য কোনো “নেসেসিটি’ দেখা যায় না।

মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন অজ্ঞান অনাদি তখন সে অনন্ত। যতক্ষণ সে আছে ততক্ষণ কাহারও মুক্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ, বেদান্ত মতে আমি সকলের অন্তর্গত এবং আমার অন্তর্গত সকলই, যতক্ষণ অজ্ঞান কোথাও আছে ততক্ষণ সে অজ্ঞান আমাকে বদ্ধ করিতেছে। এ যেন আপনার ছায়াকে আপনি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করার মতো।

কেন ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিলেন তদুত্তরে ব্রহ্মসূত্র কহেন, লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং। লোকেতে যেমন বালকেরা রাজা প্রভৃতি নানা রূপ ধারণ করিয়া লীলা করে জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের লীলামাত্র। এ মত অনুসারে, যাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত জগতের মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে, অথবা ইচ্ছা প্রতিসংহার করিলে তাঁহার জগৎরূপ জীবরূপ দূর হইয়া তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে, অতএব এ স্থলে সমস্ত জগতের বিলয় ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের মুক্তির কোনো অর্থ থাকিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিবিশেষ হওয়া তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তিবিশেষ না হওয়াও তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তিবিশেষ না হইলেও যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ তিনি লীলারূপেই বিরাজ করিবেন।

ডয়সেন্ সাহেব অন্যত্র তাঁহার দর্শনগ্রন্থে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় তত্ত্ববিদ্যা নামক পরিচ্ছেদে প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, কান্টের অকাট্যযুক্তি অনুসারে দেশকাল ও কার্যকারণত্ব আমাদের বুদ্ধির ধর্ম, বাহিরের ধর্ম নহে। অতএব বস্তুকে যে আমরা বস্তুরূপে দেখিতেছি তাহা আমাদের বুদ্ধির রচনা। এই বুদ্ধির আরোপ বাহির হইতে উঠাইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ- সেই দেশকাল কারণাতীত সত্তাকে অধ্যাপক মহাশয় শোপেনহৌয়ারের মতে উইল (ইচ্ছা) এবং বেদান্তমতে আত্মা বলিতেছেন। এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ অনবচ্ছিন্ন “উইল’ পদার্থের নেতি-আত্মক নির্গুণ ভাবই বিশুদ্ধভাব- তাহাতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, অস্তিত্ব নাই।

এই বিশুদ্ধ, দুঃখবিহীন, কামনাবিহীন নেতিত্বের আনন্দমধ্যে একটা মোহ একটা পাপের সূচনা দেখা দিল- (কোনো বিশেষকালে নহে, আজও বটে অনন্তকালও বটে অনন্তকালের পূর্বেও বটে) এই উইল এই আত্মা ইতি-আত্মক সগুণ ভাব ধারণ করিল।

মূলের ভাষা উদ্‌ধৃত করি-

Now there was formed_ not at any time, but before all eternity, today and for ever, like an inexplicable clouding of the clearness of the heavens, in the pure, painless, and will-less bliss of denial a morbid propensity, a sinful bent : the affirmation of the Will to life। In it and with it is given the myriad host of all the sins and woes of which this immeasurable world is the revealer।

মানব-বুদ্ধি চিরকাল প্রশ্ন করিতেছে সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? দুঃখের উৎপত্তি হইল কেন? শংকরাচার্য এবং ডয়সেন্ উত্তর দিতেছেন– এক অনাদি অনির্বচনীয় পদার্থে এক অনাদি অনির্বচনীয় ছায়া পড়িল তাহাই সৃষ্টি তাহাতেই দুঃখ। ইহার সরল অর্থ এই, সৃষ্টিই বা কী আর সৃষ্টির কারণই বা কী আর দুঃখ পাপই বা কেন তাহা কিছুই জানি না। এবং বেদান্ত মতে এই অনাদি অজ্ঞান হইতে মুক্তিই বা কীরূপে এবং মুক্তিই বা কাহার তাহাও সুস্পষ্টরূপে বলা যায় না।

বৌদ্ধ নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না। তাহারা এ কথাও স্বীকার করে না যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। তাহাদের মতে ব্রহ্মও নাই জগৎও নাই, আমিও নাই তুমিও নাই– তাহাদের যুক্তি কিছুকাল পূর্বে “সাধনা’য় অনুবাদ করিয়া দেখানো হইয়াছিল। যাহা অনাদিকাল আছে তাহা অনন্তকালে ধ্বংস হইতে পারে না, তাহাকে মায়াই বল আর সত্যই বল, অতএব তাহাকে একবার স্বীকার করিলে মুক্তি স্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না তাহাদের পক্ষে সকল কথাই সহজ। যদি বলি কিছুই যদি নাই তবে তুমি তাহা প্রমাণ করিতেছ কী করিয়া। তখন তাহারা প্রমাণ করিতে বসে যে, তাহারা প্রমাণ করিতেছে না। যদি বলি, কিছুই যদি নাই তবে তুমি মুক্তির কথা পাড় কেন– তখন সে বলে যখন আমিই নাই, তখন আমি কোনো কথা বলিতেছি ইহাও হইতে পারে না। অতএব কোনো কথাই স্বীকার না করিলে গায়ের জোর খাটানো সহজ হয়। কিন্তু যখনই এক স্বীকার করা গেল অমনি দুই প্রমাণ করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং দুই স্বীকার করিলেই তাহাকে এক এক বলিয়া চালানো কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কী বল? আমি আদি অন্ত মধ্য কিছুই জানি না, আমি কেবল এইটুকু জানি, আমার হৃদয়ে যে প্রীতি ভক্তি দয়া স্নেহ সৌন্দর্যপ্রেম আছে তাহা অনন্ত চরিতার্থতা চায়– এমন-কি, আমার সেই-সকল আকাঙক্ষার মধ্যেই আমি

অনন্তের আস্বাদ পাই- সেই আমার সর্বসফলতা যিনিই হৌন, যেখানেই থাকুন, তিনিই আমার ব্রহ্ম তাঁহাতেই আমার মুক্তি।

সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১

রামমোহন রায়

একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট বর্ণনা-শ্রবণ-কালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদমহিমা বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যৎকালের সীমান্ত পর্যন্ত স্নেহচিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি এখনো আমাদের প্রতি সেই নব্যবঙ্গের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনো রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষন্নবিশাল দৃষ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন সেদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন না– সেদিন যে পথ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মূর্তি-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন বঙ্গসমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল– তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরি পরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনো বঙ্গসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই; তখন ছোটো ছোটো গ্রামসমাজ-পল্লীসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া ছিল; ব্যক্তিবিশেষের জাতিকুল,

কার্য অকার্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সংকীর্ণ গ্রাম্যমণ্ডলীর সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল– এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নববিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাংলাদেশের প্রভাতবিহঙ্গেরা ইংরাজি-অনুবাদ-মিশ্রিত সংগীতে দিগ্‌বিদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাংলাভাষায় মর্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে। তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কী করিয়া বুঝিতে হয় রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা গদ্যে পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোথাও-বা কণ্টকিত কোথাও-বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে– আজ সভা-সমিতি আবেদন-নিবেদন আলোচনা-আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদে বঙ্গভূমি শুকপক্ষীকুলায়ের ন্যায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলত, বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর দেখা যাইতেছে। কিন্তু, তথাপি আমি কল্পনা করিতেছি– যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে

মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি এখনো তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই, এখনো তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

হিমালয়ের দুর্গম নির্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটি নির্মল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ তপঃপরায়ণ বিষাদ বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ– তাহা অবসাদ নহে, নৈরাশ্য নহে; তাহা দূরগামী সংকল্প, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী মহৎ

প্রকৃতির ধ্যানধৈর্যের বিশালতা, অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমা; অতলস্পর্শ নির্মল সরোবরে শ্যামলতা যেরূপ উজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ অন্তঃকরণের বিষাদ সেইরূপ জ্যোতির্ময়, সেইরূপ বহুদূরবিস্তীর্ণ। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল সে বঙ্গভূমি তখন কোথায় ছিল এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার বঙ্গভূমির সমস্ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিমদিক্‌প্রান্তভাবে স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়াপুরীর মতো বিরাজ করিতেছিল। যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ মূঢ়ের মতো তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দূরাগত সংগীতধ্বনির প্রতি কান পাতিয়াছিলেন; সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি প্রসারিতবাহু বিশ্ববন্ধুর ন্যায় সেই মানস বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার জ্যোতির্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সংগীত, সে দৃশ্য, ভবিষ্যতের সেই স্বর্গীয় আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে বর্তমান ছিল না, তাহারা তাঁহার সেই উদার ললাটের উপর সততসঞ্চরমাণ ছায়ালোকের কোনো অর্থই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত; বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণকল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার; ধর্ম তাহাদের লোকাচারপ্রচলিত ক্রিয়াকর্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগত-প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ-বেতনলাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, যদি সেই সংকীর্ণ বর্তমান কালের মধ্যে আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন, তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না– তাহা হইলে তাঁহার মাতৃভূমিকে আপন আদর্শলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই পৃথিবী একই মৃত্তিকা, তথাপি মহাপুরুষদিগের জন্মভূমি আমাদের হইতে অনেক স্বতন্ত্র। এই পৃথিবী এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের পদতলে বহু উর্ধ্বে উন্নত হইয়া উঠে। যখন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সমভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন তখনো তাঁহারা পর্বতের শিখরাগ্রভাগে আছেন; সেইজন্য

তাঁহারা গৃহের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, বর্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে, ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আমরা ভূগোলবিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকের সহিত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণদৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ-অভিমুখে কিয়দ্দূর প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে বাস করি না যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত-আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ব-বিধাতার নীরব মাভৈঃশব্দের সহিত নিরন্তর বিচিত্র স্বরে সম্মিলিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রতি বিশ্বাসহীন নহি, কিন্তু আমরা সেই স্বাভাবিক সমুচ্চ আসনের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত নহি যেখান হইতে ইহলোক-পরলোকের জ্যোতির্ময় সংগমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অন্তরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সেইজন্য আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা; সেইজন্যই আমাদের সংকল্প এমন দুর্বল, আমাদের উদ্যম এমন স্বল্পপ্রাণ; সেইজন্যই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ আমাদের নিকট একটি সুমধুর কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্তবিস্তীর্ণ উর্বরক্ষেত্র আর আমরা দেখিতেই পাই না। মর্ত্যসুখ যখন স্বর্ণমায়ামৃগের মতো আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ, বর্তমানের উপস্থিত বাধাবিপত্তি, মর্ত্যসুখের বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য, আর-সমস্ত শুনা কথা– শিক্ষালব্ধ মুখস্থবিদ্যা এবং ছায়াময় কল্পনা। কিন্তু মহাপুরুষদের নিকট আমাদের সেই-সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য; বস্তুত সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। আমাদের সংসার, আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণাম-স্বরূপে আবৃত করিয়া রাখে না।

রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য- সত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরে

নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজন বেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনোক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের পুরাতন লূতাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে নির্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্রয়লাভ করে, তদ্বারা অন্তরাত্মাকে খর্ব জীর্ণ জড়বৎ করিয়া রাখে, তাহা আমৃত্যুকাল জানিতেও পারে না–রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হইতেই সেই-সকল জড় সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না। নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অভ্রংলিহ শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয়, কিশোর রামমোহন রায় সেইরূপ বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া অভ্রভেদী অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকাচার, সামাজিক সংস্কার, বহুপুরাতন হইতে পারে, কিন্তু সত্য তদপেক্ষা পুরাতন সেই চিরপুরাতন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙালি বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই সত্যের অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, লৌকিক সুখশান্তি, এই গৃহপালিত তরুণ বাঙালির নিকটে কেমন করিয়া এত তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যসুখের আস্বাদ সে কবে কোথায় লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার চিরপ্রচলিত ক্রীড়নকগুলি তাহার সম্মুখে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল; বালক কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “ইহা নহে, ইহা নহে– আমি ধর্ম চাহি, ধর্মের পুত্তলি চাহি না; আমি সত্য চাহি সত্যের প্রতিমা চাহি না।’ বঙ্গমাতা কিছুতেই এই বালকটিকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না। –সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধ্যানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্-এক সময় কেমন করিয়া বাংলাদেশের সমস্ত দেশাচার-লোকাচারের উপরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার-অনুষ্ঠানই চরম নহে, ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতপিপাসু ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্যভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহির্বর্তী অনন্ত দৃশ্য দেখাইয়া দেয়, তখন তাঁহারা বরঞ্চ নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু সেই বিশ্ববেষ্টনকারী দৃশ্যাতীত অনন্ত সত্যলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অমৃতরসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদ-পুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খৃস্টধর্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরানের মূল মন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই সে বিনা চেষ্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত দেখিতে পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবনযাপন করিতে চাহে- কর্তব্যবিমুখ অলস ধাত্রীর ন্যায় মোহ-অহিফেন-সেবনে অভ্যস্ত করাইয়া অন্তরাত্মার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ক্রন্দন নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্বসাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পরিপুষ্ট সুচিক্কণ হইয়া উঠে।

একদিন বহুসহস্রবৎসর পূর্বে সরস্বতীকূলে কোন্-এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন্-এক বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্ত স্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন-

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিবধামবাসী অমৃতের পুত্র-সকল, তোমরা শ্রবণ করো- আমি সেই তিমিরাতীত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন- হে মোহশয্যাশায়ী পুরবাসীগণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি- তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের পুরাতন শুষ্ক পর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণীগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপবর্তিকায় অগ্নি যখন ধরিয়া উঠে তখন সেই শিখা লুক্কায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ত্ত নহে- আমরা রুষ্ট হই আর সন্তুষ্ট হই, সে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না- সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল- সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন করুক, তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভৃতগৃহবাসসুখ নাই, বঙ্গসমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিকূলতার রোষগর্জনের ঊর্ধ্বে কণ্ঠ তুলিয়া বলিতে হইবে- মিথ্যা! মিথ্যা! হে পৌরগণ, ইহাতে মুক্তি নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই, ইহা ধর্ম নহে, ইহা আত্মার উপজীবিকা নহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে স্তূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য হয় না, তাহা মহৎ হয় না; সত্যের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার পূজা করো- যে ভক্তি যেখানে-সেখানে অর্ঘ্য-উপহার স্থাপন করিয়া দ্রুত তৃপ্তি লাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্য, তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অবহেলা, তাহাতে আত্মা বললাভ জ্যোতিলাভ মুক্তিলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ত্বজালে জড়িত হইয়া সুপ্তিমগ্ন হইতে থাকে।

গ্রহণ করা এবং বর্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল থাকিলে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে; যখন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া বহুলাংশে যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অম্লজান বায়ু গ্রহণ করি, অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নূতন শারীর কোষ নির্মাণ করিতেছে– কী করিয়া যে তাহা আমরা জানি না।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে গূঢ়ভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে আমাদের কর্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গুরুতরদায়িত্বপূর্ণ। ভালোমন্দ পাপপুণ্য শ্রেয়প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক চেষ্টায় গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্যও। এ কার্য যদি সম্পূর্ণ জড়বৎ যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিত না– তবে ধর্ম ও নীতিশব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণবর্জনকার্য এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্তব্যকার্য সতর্কভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক পুরাতন আবর্জনা সঞ্চিত হইতে থাকে, অনেক নূতন পোষণপদার্থ দূরে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করে আমরা আমাদের মৃত বস্তুগুলিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না, এইজন্য সকল মনুষ্যসমাজ এবং সকল ধর্মেরই চতুর্দিকে বহুযুগসঞ্চিত পরমপ্রিয় মৃতবস্তুগুলি উত্তরোত্তর স্তূপাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়– অভ্যন্তরের বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়ুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিত ভাবে এই বিষবায়ুর মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহারা বুঝিতে পারে না যে, তাহারা কী আলোক কী স্বাস্থ্য কী মুক্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মমত্ববশত ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে

পবিত্র অগ্নি উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়া কখন নির্বাপিত হইয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হয় যে যাহা মুখ্য বস্তু, যাহা সারপদার্থ, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অনভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না; যাহা গৌণ, যাহা ত্যাজ্য, তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি বজ্রস্বরে বলেন, যে মিথ্যা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সত্য অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিয়ো না। তখন এই অতিপুরাতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। কেহ-বা বলে, “সত্যকে মিথ্যা স্তূপের মধ্য হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্ট আমরা স্বীকার করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।’ অর্থাৎ যাহা বর্জনীয় তাহা বর্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই মহাপুরুষ বিধিপ্রেরিত উদ্যত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জনাস্তূপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধূর্জটি যখন মৃত সতীদেহ কোনোমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, নিষ্ফল মোহে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণু আপন সুদর্শনচক্র-দ্বারা সেই মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানব-সমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণ বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র লইয়া আবির্ভূত হন- সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম হইতে কে নিবৃত্ত করিতে পারে?

সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে। বরঞ্চ যে জাতি সজীব সচেষ্ট, যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য করে, সানন্দমনে

জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে, যাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ কখনো অবরুদ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়, আপন দূষণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি; বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই যাহার সাহায্যে আমরা বাহিরের শত্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি; সমাজের মধ্যে সেই জীবনশক্তির ঐক্য নাই যদ্দ্বারা আমরা বিপৎকালে এক মুহূর্তে এক হইয়া গাত্রোত্থান করিতে পারি; আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনো মহৎ সংকল্পসাধন কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই- সেইজন্য আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের হৃদয় রাজপুরুষদের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিস্তেজ, আমাদের অন্তঃকরণ বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বৎ হইয়া আসিয়াছিল। এমনস্থলে আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম যে আপনি আদিম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্নভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। যদি রক্ষা করিত তবে সে উজ্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত; তবে আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত হইত না; তবে আমরা লোকসমাজে সর্বদা নির্ভীকভাবে অসংকোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। যাহার ধর্ম যাহার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই। বারুদ এবং সীসকের গোলক-দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা সকল দুর্বলতার মূল সমাজের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নূতন-রচিত মত সত্য, আমার এই নূতন-উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন- সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্কযুক্তিদ্বারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর

করিতে হইবে। যেমন বলের দ্বারা ধূম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়- রামমোহন রায় সেইরূপ ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত নূতন কালিমা সেই পুরাতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, হায়, আমাদের পক্ষে সেই পুরাতন জ্যোতিই নূতন, এই নূতন কালিমাই পুরাতন; সেই সনাতন বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে, আর এই-সমস্ত অধুনাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে, আমাদের চিন্তায় কার্যে, আমাদের সুখে দুঃখে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে- চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুর্দিকে দেখিতে পাই, শাস্ত্র উদ্‌ঘাটন না করিলে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব, হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত; আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।

তাহা হউক, সত্যকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু, একবার যখন সে প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমশ পরিচয় হইবে। সত্যের পথ যদি বাধাগ্রস্ত না হয় তবে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না; সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিষ্পীড়িত করিয়া তবে আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল স্থায়িতা বুঝিতে পারি। যে প্রিয় পুরাতন মিথ্যা আমাদের গৃহে আমাদের হৃদয়ে এতকাল সত্যের ছদ্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি? সত্য যখন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের বক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া যাইবে তখন তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের শোণিতপাত এবং অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পুরাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মুষ্টি হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে সে লোক নূতন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। পুরাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদু, নূতনের জন্য

আনন্দ সেখানে ম্লান। অবসন্ন রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্রুজলের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর রূপে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব, না না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দূর করিয়া দাও; তাহার পর একদিন বলিব, এসো এসো হে সর্বশ্রেষ্ঠ, এসো হে হৃদয়ের মহারাজ, এসো হে আত্মার জাগরণ, তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মৃত হইয়া ছিলাম।

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন।
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন।
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা- -
পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা_
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়,
মোহ-অঙ্কুর করো গো বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণসাধন।

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই, যখন আবাহন করিব তখন একান্তমনে সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব- প্রবল দ্বন্দ্বের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পণ করিব তখন সম্পূর্ণরূপেই করিব, তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনো সত্যমিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ, যে সমাজে সত্যমিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এমন-কি, জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যে কোনো গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারংবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রামমোহন রায় শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া যে ধর্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনো তাহাকে সকলে গৃহে আহ্বান করিয়া লয় নাই; এমন-কি, এক-এক সময় আশঙ্কা হয় সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু, সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন– আমরাও অগ্রে সে ধর্মকে প্রকৃতরূপে সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়, সত্যকে কেবল পঠিত মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে যথার্থ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে– অনেকে যাঁহারা মনে করেন "জানিয়াছি' তাঁহারাও জানেন না। রামমোহন রায় যে নিদারুণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই; আমরা কেবল পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই এবং মনে করি যে, তাহা সত্য এবং তাহা বুঝিলাম। কিন্তু, আমাদের অন্তরাত্মা আকাঙক্ষা-দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একান্তভাবে লাভ করে না।

এখনো আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার সঞ্চার হয় নাই, সত্যধর্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই; যে ধর্ম স্বীকার করি সে ধর্ম বিশ্বাস না করিলেও আমাদের চলে, যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতিবোধ হয় না– আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া

সে সম্বন্ধে আমাদের এমন অবিনয়, এমন চাপল্য, এমন মুখরতা। কোনো সন্ধান, কোনো সাধনা না করিয়া, অন্তরের মধ্যে কোনো অভাব অনুভব বা কোনো অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া, এমন অনায়াসে কোনো-এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বন-পূর্বক উকিলের মতো নিরতিশয় সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য-পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছুদিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে– তখনি সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সত্যলাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্তুত-সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সত্যলাভের পথে স্থাপন করা বহুগুণে শ্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা, নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা তর্কবিতর্ক এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব; ধর্মের নানারূপ ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব; অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে সুধাস্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ক্ষুধিত পিপাসিত অন্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিস্তার করিয়া শ্রান্তি বৈ পরিতৃপ্তি নাই– তখন যথার্থ অনুসন্ধান পড়িয়া যাইবে এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্য-পানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন চেষ্টার যে রাজপথ বাঙালিকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক হইবে এবং তখন রামমোহন রায়ের সেই শকট আপন গম্যস্থানে আত্মার বিদ্যামন্দিরে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।–

“হে অন্তর্যামিন্, পরমেশ্বর, আমাদিগকে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ করো ইতি। ওঁ তৎসৎ।’

ভারতী, কার্তিক, ১৩০৩

সুখ না দুঃখ

উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য

লেখক মহাশয়ের লেখনী অজ্ঞাতসারে বামের দিকেই কিঞ্চিৎ অধিক হেলিয়াছে- তিনি মনে মনে দুঃখকেই যেন বেশি প্রাধান্য দিয়াছেন। কারণ, সংসারে যদি সুখের পরিমাণ অধিক থাকে তাহা হইলে মীমাংসার তো কোনো গোল থাকে না। জমা অপেক্ষা খরচ অধিক হইলে তহবিল মেলে না- জগতের জমাখরচে যদি দুঃখটাই বেশি হইয়া পড়ে তবে জগৎটার হিসাব-নিকাশ হয় না।

ধর্মব্যবসায়ীরা অন্ধভাবে বলপূর্বক দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ করিয়া কেবল ছেলে-ভুলানো হয় মাত্র। যাঁহারা সংসারের দুঃখতাপ অন্তরে বাহিরে চতুর্দিকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জগতের দুঃখের অংশ কোনোমতে গোঁজামিলন দিয়া সারিয়া লইবার চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়ের কাজ। জগতে এমন শত সহস্র দুঃখ আছে যাহার মধ্যে মানববুদ্ধি কোনো মঙ্গল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারে না। এমন অনেক কষ্ট অনেক দৈন্য আছে যাহার কোনো মহিমা নাই, যাহা জীবের আত্মাকে অভিভূত সংকীর্ণ শ্রীহীন করিয়া দেয়- দুর্বলের প্রতি সবলের, প্রাণের প্রতি জড়ের এমন অনেক অত্যাচার আছে, যাহা অসহায়দিগকে অবনতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে- আমরা তাহার কোনো কারণ, কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই না। মঙ্গল পরিমাণের প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস আছে তিনি এ সম্বন্ধে বিনীতভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং জগদীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিথ্যা ওকালতি করিতে বসা স্পর্ধা বিবেচনা করেন। অতএব জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহি না।

কিন্তু অনেক সময়ে একটা জিনিসকে তাহার চতুর্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে গেলে তাহাকে অপরিমিত গুরুতর করিয়া তোলা হয়। দুঃখকে বিশ্লিষ্ট

করিয়া একত্র করিলে পর্বতের ন্যায় দুর্ভর ও স্তূপাকার হইয়া উঠে, কিন্তু স্বস্থানে তাহার এত ভার নাই।

সমুদ্র হইতে এক কলস জল তুলিয়া লইলে তাহা বহন করা কত কষ্টসাধ্য, কিন্তু জলের মধ্যে যখন ডুব দেওয়া যায়, তখন মাথার উপর শত সহস্র কলস জল তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার ভার অতি সামান্য বোধ হয়। জগতে ভার যেমন অপরিমেয়, ভার সামঞ্জস্যও তেমনি অসীম। পরস্পর পরস্পরের ভার লাঘব করিতেছে। চিরজীবন নিত্যবহন করিবার পক্ষে আমাদের শরীর কিছু কম ভারী নহে। স্বতন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলে তাহার ভারের পরিমাণ যথেষ্ট দুঃসহ মনে হইতে পারে। কিন্তু এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, আমরা তাহা অক্লেশে বহন করি। সেইরূপ জগতে দুঃখ অপর্যাপ্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা লাঘব করিবারও সহস্র উপায় বর্তমান। আমরা আমাদের কল্পনাশক্তির সাহায্যে দুঃখকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা নির্মাণ করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত সংসারের মধ্যে সে অনেকটা লঘুভারে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই কারণেই এই দুঃখপারাবারের মধ্যেও সমস্ত জগৎ এমন অনায়াসে সন্তরণ করিতেছে, অমঙ্গল মঙ্গলকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না, এবং আনন্দ ও সৌন্দর্য চতুর্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

সাধনা, মাঘ, ১২৯৯